পাষাণের কথা

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা

১৩২১

মূল্য ১৲ একটাকা

কলিকাতা
২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্যারাগণ প্রেস
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

গ্রন্থকারের নিবেদন

পাষাণের কথা "আর্য্যাবর্ত্তে" প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে লিখিত হইয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে পত্রিকার নামের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু ফলে তাহা একটী দীর্ঘ ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছিল। লিখিবার সময় বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নিকট নানাবিধ সাহায্য পাইয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লেখা শেষ হইলে উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া প্রত্নবিদ্যার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছি, সেই আচার্য্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ইহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপক্রমণিকা না থাকিলে আমার উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্যর্থ হইত। "পাষাণের কথা" প্রাচীন পাষাণের কথা হইলেও ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকা, ইহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস নহে।

৬৫ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
২১শে বৈশাখ, ১৩২১।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

पित्रे

ভূমিকা
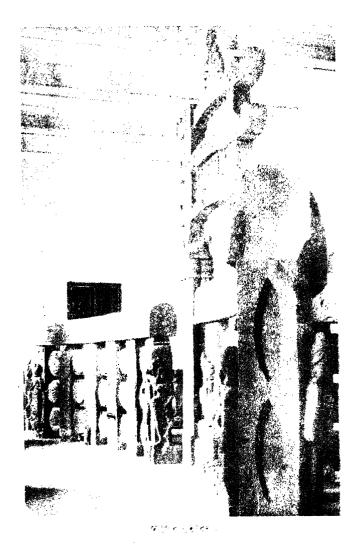
পুরাণ কথা কে বলে, বলিবার লোক নাই। বুড়া মানুষে না হয় ১০০।১৫০ বৎসরের কথা বলিল, ইহার অধিক হইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লেথায় পড়ায় রাখিয়া গেলে সে কথা অনেক দিন থাকে সত্য, কিন্তু যে জিনিসে লেখা হয়, সে ত আর বেশী দিন টিকে না। কাগজ ৮।৯ শত বৎসর টিকে, তালপাতা ১২।১৪ শত বৎসর টিকে, ভুর্জ্জিপত্র ১৫।১৬ শত বৎসর টিকে, পেপিরস না হয় দুহাজার বৎসর টেঁকিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে গেলে কাহার কাছে ন্ন অন্য উপায় নাই। তাও আবার সকল পাথরে হয় না। বেলে পাথর ৫০।৬০ বৎসরে ক্ষইয়া যায়। অনেক শক্ত পাথরে চটা উঠিয়া যায়। কেবল দুই প্রকার পাথরে আঁক চিরকাল থাকে। এক রকম পাথর আগুনের তাতে গলিয়া যায়, তাকে ধাতু কহে; আর এক রকম পাথর কিছুতেই গলে না, ক্ষয় হয় না, তাহাকে পাষাণ বলে। পুরাণ কথা শুনিতে গেলে এই পাষাণকে কথা কহাতে হয়, নহিলে পুরাণ কথা শুনিবার উপায় নাই।

অন্যদেশে বরং ৩।৪ হাজার বৎসরের খবর পাওয়া যায়, কেননা সেখানকার পণ্ডিতেরা যে সকল পুঁথি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বারবার নকল হইয়া আজ পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। আমাদের দেশেও এরকম অনেক পুঁথি আসিয়া পঁহুছিয়াছে; তাহাতেও আছে সবই,—যাগ আছে, যজ্ঞ আছে, আইন আছে, কানুন আছে, চিকিৎসা আছে, জ্যোতিষ আছে, ব্যাকরণ আছে, কাব্য আছে, অলঙ্কার আছে, বিজ্ঞান আছে—আছে

সবই, নাই কেবল সেকালের পুরাণ কথা। পুরাণ কথা কহিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভালবাসিতেন না; ঐ কথাটি কহিতে ঋষিদের মুখ বন্ধ, মুনিদের মুখ বন্ধ, কবিদের মুখ বন্ধ, দর্শনের মুখ বন্ধ, বিজ্ঞানের মুখ বন্ধ, জ্যোতিষের মুখ বন্ধ। সুতরাং আমাদের দেশে পুরাণ কথা যদি শুনিতে চাও তাহা হইলে পাথরকে কথা কহাও, নহিলে ভারতের পুরাণ কাহিনী বলিবার আর লোক নাই।

পাষাণ বড় শক্ত জিনিস, বাহিরও শক্ত ভিতরও শক্ত; কথা কহিতে গেলে শব্দ করিতে হয়। শব্দ ফাঁপা জিনিষ ভিন্ন হয় না, অথচ পাষাণ নিরেট। ন্যায়শাস্ত্রে বলে শব্দ আকাশের গুণ; পাষাণের মধ্যে আকাশ থাকিতে পারে না, সুতরাং পাষাণকে কথা কহান বড় শক্ত ব্যাপার। আকাশ ত আকাশ! পাষাণের উপর বাটালিও চলা কঠিন। সে কালের রাজা রাজড়ারা বাটালি দিয়া কুঁদিয়া পাষাণে দুইচারিটী কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পাষাণ তারই প্রতিধ্বনি করে মাত্র। যখন হাজার হাজার বৎসর পরে বাটালির দাগ মিলাইয়া যাইবে, তখন সে প্রতিধ্বনি বন্ধ হইবে; ইতিমধ্যে পাষাণ তোমায় দু চারিটী কথা শুনাইতে পারিবে। আমাদের দেশময় অনেক অনেক জায়গায় পাষাণে এইরূপ বাটালি কাটা লেখা আছে। সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশের পুরাণ ইতিহাস।

পাথরের কথা বুঝিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না, আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না। অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রিন্সেপ সাহেব পাষাণের ভাষার অক্ষর-পরিচয় আরম্ভ করেন। তারপর কীটো, কনিংহাম, বিউলার প্রভৃতি বড় বড় সাহেবরা সে ভাষা বুঝিতে শিখেন। এখন এদেশের লোক অনেকে পাষাণের কথা কহিতে পারে, পাষাণের কথা বুঝিতে পারে ও লোকজনকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু পাষাণ ত অতি অল্প কথা কয়। একখানি শিলাপত্রে একটি মাত্র

ঘটনার কথা থাকে। অনেক শিলাপত্র একত্র না করিলে ইতিহাস পাওয়া যায় না। শিলাপত্রও আবার একজায়গায় থাকে না। কোনখানি হিমালয়ে, কোন খানি বিন্ধপর্ব্বতে, কোন খানি উরুবেলায়, কোন খানি আবার সুদূর নীলগিরিতে। এসকল সংগ্রহ করা বড় পরিশ্রমের কাজ। ইংরাজের নাকি বড় রাজত্ব, প্রচুর ক্ষমতা এবং অনন্ত জ্ঞানপিপাসা; তাই তাঁহারা এই সমস্ত শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন। যাহা আমাদের সাধ্যের অতীত, তাঁহারা তাহা সুসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক বিষয়েই আমরা ইংরাজের ঋণ শুধিতে পারিব না, এ বিষয়ে কিন্তু ইংরাজের নিকটে আমরা অনন্তকাল ঋণী থাকিব। এ ঋণ একেবারে শোধ হইবার নয়।

যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধদেবের পরম ভক্তেরা চাঁদা করিয়া পাথর কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করিত এবং তাহার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং সেই স্তূপকে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের একত্র মিলন বলিয়া মহা ভক্তিভরে তাহার পূজা করিত; সেই স্তূপের চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল দিত। টোকা টোকা থামের উপর রেলিং, আর দুই দুইটা থাম মিলাইবার জন্য তিনটী করিয়া সূচী। এমন করিয়া পালিস করিত যে হাত দিলে হাত পিছলাইয়া পড়িত। প্রত্যেক থামে, প্রত্যেক সূচীতে ও রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাঁদা দিত তাহার নাম লেখা থাকিত। ভারতবর্ষে এরূপ স্তূপ অনেক ছিল, দুই চারিটী এখনও আছে। এই স্তূপে অনেক পাষাণ আছে, তাহারা সকলে মিলিয়া অনেক কথা কয়, আমাদের অনেক পুরাণ কথা শুনায়, আমাদের যে গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার মনে করাইয়া দেয়।

বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে এইরূপ একটী প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল, কালের কুটীল গতিতে বৌদ্ধদ্বেষীদিগের উৎপীড়নে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলিংয়ের যে অংশটুকু আভাঙ্গা টাট্‌কা ছিল,

কনিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় যাদুঘরে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন। এ স্তূপেরই একখানি পাথর কি কি পুরাণ কথা কহিতে পারে, আপনারা শুনুন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এই সকল পাষাণের কথা অনেক পরিশ্রমে, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, এবং আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পাষাণের কথা

[১]

আমার সময়ের ধারণা নাই, সুতরাং আমার জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে কত কাল অতীত হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিতেছি। শৈশবের কথা এইমাত্র মনে পড়ে যে, প্রশান্ত, সমুদ্রসৈকতে আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ খেলা করিয়া বেড়াইতাম—বায়ুভরে উড়িয়া যাইতাম, ঘূর্ণবাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতাম; কখন বা সমুদ্রের জলে পতিত হইতাম; জল সরিয়া গেলে—ভূমি শুষ্ক হইয়া গেলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতাম। সে সমুদ্রের বিশালতা ধারণা করিবার শক্তি তোমাদিগের নাই; সে সমুদ্রসৈকতের বিস্তৃতি তোমাদিগের মহাপ্রদেশ সমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক। যে সকল জলজন্তু সেই মহাসমুদ্রে বাস করিত যৌবনের মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই। আমার শৈশবে আমি একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তোমাদিগের এই সংগ্রহশালায় সেই মহাসমুদ্রের জীবজন্তুর অস্থি আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্বেতকায়, বিরলকেশ একজন সাধক পর্ব্বত ভেদ করিয়া সেই সকল জীবজন্তুর অস্থি লইয়া আসিয়াছিলেন।

কতদিন সমুদ্রসৈকতে উড়িয়া বেড়াইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অবস্থান্তরপ্রাপ্তির পূর্ব্বের কথা সামান্যমাত্র আমার মনে পড়ে। একদিন

মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যতপ্ত বায়ু আমাকে অপর কতকগুলি বালুকণার সহিত সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে দিন যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনে আর কোন দিন তত দূর আসিতে পারি নাই। আমার জীবনযাত্রায় সেই প্রথম পাদক্ষেপ। সে দিন বুঝিতে পারি নাই যে, পরে অতীত-কালের সাক্ষিস্বরূপ বহুযুগের ইতিহাস বহন করিয়া আমাকে সংগ্রহ-শালায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সে দিন যে স্থানে আসিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে সমুদ্রের জল সরে না, সুতরাং শৈশবের আবাসভূমি আর কখনও দেখি নাই।

সমুদ্রগর্ভে অপরাপর বালুকণার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি। কত অপরূপ জলজন্তু আমাদিগের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইত! আমরা তাহাদিগের জন্মমৃত্যু দেখিতাম। বালুকাময় সমুদ্রগর্ভে তাহাদিগের জন্ম হইত। তাহারা আমরণ সেই বালুকাক্ষেত্রেই বাস করিত। জীবনান্তে তাহাদিগের অস্থিগুলি শুভ্র বালুকাক্ষেত্রটিকে শুভ্রতর করিয়া তুলিত। সেই সকল অস্থি তোমাদিগের অতীত জীববিগ্যার মূল। তোমরা সেই যুগের কোন জীবেরই সমগ্র কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে পার নাই, একখানি দুইখানি অস্থি লইয়া তোমরা অতীত যুগের জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহ; কিন্তু তাহা হয় না। অতীতের সাক্ষী, আমি—সেই সকল জীব দেখিয়াছি। আমি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছি; তাহাদিগের জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাহাদিগের চৈতন্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছি; জীবনান্তে বহুযুগ তাহাদিগের অস্থিনিচয় বক্ষে ধারণ করিয়াছি—আমি বলিতেছি, তাহা হয় না। তোমরা অতীত যুগের জীবন সমূহের যে চিত্রাবলি রাখিয়াছ তাহা হাস্যোদ্দীপক। বালুকণার যদি উচ্চহাস্য করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমার

উচ্চহাস্যে তোমাদিগের এই গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আমি দেখিয়াছি, আমার স্মরণ আছে, কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, তোমাদিগের মত বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং সব জানিয়াও আমার কিছু বলা হইল না।

সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকাক্ষেত্রে কত দিন বাস করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সময়ের ধারণা নাই। শৈশবে যে আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। একদিন সূর্য্যাস্ত-কালে কোন দারুণ আঘাতে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল, গভীর আলোড়নে বিশাল জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, বহু জলজন্তুর জীবনান্ত হইল—আমি মূর্চ্ছিত হইলাম। তাহার পর কালপ্রবাহ কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? অজ্ঞান অবস্থায় আমি যেন অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতাম, যেন দুর্ব্বিসহ যাতনা অনুভূত হইত, বোধ হইত যেন কেহ ভীষণ বলে আমার ক্ষুদ্র দেহখানি ক্ষুদ্রতর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত আর কিছুরই স্মরণ নাই। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, অজ্ঞাত শক্তির প্রয়োগে বালুকাক্ষেত্রে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সেই সমুদ্রসৈকত, সেই বিশাল জলরাশি, সেই সব জীবজন্তু উদ্ভিদ্ সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। সে জগৎ আর নাই; অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বালুকাকণা একত্র হইয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে, আমার শৈশবের দেহ তখন বিশাল অশ্মখণ্ডের কণিকামাত্রে পরিণত হইয়াছে,—আমার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে।

চেতনার প্রারম্ভে দেখিলাম, নূতন জগতে তৃণশষ্প, তরুলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে নূতন জগতের আকার অনেকটা বর্ত্তমান জগতের ন্যায়। তাহার পর স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

আমি তখন যে প্রস্তরখণ্ডের দেহে লীন হইয়াছিলাম মূর্চ্ছা অবসানে দেখি, তাহার দেহ স্নিগ্ধ শ্যামদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত; নূতন আকারের চতুষ্পদ জীব তাহার উপরে বিচরণ করিতেছে। সময়ে সময়ে মসীকৃষ্ণবর্ণ ছাগচর্ম্মাচ্ছাদিত তোমাদিগের স্বশ্রেণীর জীবগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত। তাহারা নখ, দন্ত, বা উপলখণ্ডের সাহায্যে চতুষ্পদ জীবগুলিকে জয় করিবার চেষ্টা করিত ও লোকবলের আধিক্যে অনেক সময় তাহাদিগকে নিধন করিতে সমর্থ হইত; কিন্তু কখনও কখনও শৃঙ্গের তাড়নায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেও বাধ্য হইত। আমার নিকটে ইহাই মানব-জীবনের ইতিহাসের সূত্রপাত। মনুষ্য আমার নিকটে তখন নবজাত জীব। আমি যখন জ্ঞানলাভ করি তখন মনুষ্যজাতি উন্নতির পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভের কথা বলিতে আমি অক্ষম। আমি সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্যজাতীয় যে সকল জীব দেখিয়াছিলাম, তাহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি ছিল এবং মৃগয়াই তাহাদিগের উপজীবিকা ছিল বলিয়া বোধ হইত। শুনিয়াছি তদ্বংশীয়েরা দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে অদ্যাপি বাস করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বলবান জাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহারা এখন বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছে; বৃহদাকার জন্তুর অভাবে তাহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারাই এই দেশের প্রকৃত অধিপতি, কারণ মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভে ইহারাই শুষ্ক ভূমির এই অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরে তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়া এ দেশে বাস করিতেছে তাহারা সকলেই দস্যু ও অধর্ম্মচারী। যে কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় মনুষ্যজাতির কথা বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল—শতাধিক ব্যক্তিকে কখনও একত্র হইতে দেখি নাই। তাহারা ধাতুর ব্যবহার

জানিত না, শিলাখণ্ডই তাহাদিগের একমাত্র আয়ুধ ছিল। কিছুকাল পরে সে জাতীয় মনুষ্য এ প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। তাহারা কোথায় গেল, কেন গেল, তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখনও আমরা ভূগর্ভ-নিহিত ছিলাম। তোমরা অনুমান কর, সভ্যতর জাতি আসিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার মনুষ্যজাতির ধ্বংসসাধন করিয়াছিল। তাহার কতকটা সত্য হইতে পারে, কারণ ইহার পরবর্ত্তী মনুষ্যেরা উজ্জ্বল ধাতুময় অস্ত্রের সাহায্যে মৃগয়া করিত। একদিন একজন ঐরূপ অস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দূরে পাটলীপুত্রবাসী ভিক্ষুদত্ত যে স্তম্ভ দেখিতেছ উহার একপার্শ্বে অদ্যাবধি সেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পরে জানিয়াছি, ঐ ধাতু তাম্র। শুনিয়াছি, যে জাতীয় মনুষ্য তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তীর্ণ দাক্ষিণাত্যে এখনও বাস করিতেছে। তোমাদের সংগ্রহ-শালায় তাম্রনির্ম্মিত আয়ুধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু তুমি বোধ হয় এই জাতীয় অস্ত্র অনেক দেখিয়াছ। তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন পূর্ব্ববাসীরা তাড়িত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে বিজেতারাও লৌহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাম্রের ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। একদিন রাত্রিকালে তাম্র-নির্ম্মিত অস্ত্রধারী কতকগুলি লোক আমাদিগের বক্ষের উপর আসিয়া কয়েক স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিল। বহুকাল পরে সেই দিন ঐ আলোক দর্শন করিলাম। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা যাহা বলিয়াছি তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বালুকাকণার নিকট শুনিয়াছিলাম। অগ্নির সাহায্যে ক্রমে আমাদিগের বক্ষ ও পার্শ্বস্থিত তৃণক্ষেত্র ভস্মে পরিণত হইল। দারুণ উত্তাপে আমরা

বদীর্ণ হইয়া গেলাম ও জনগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ক্ষণকাল পরেই শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুদীর্ঘ পিঙ্গলবর্ণকেশধারী কতকগুলি মনুষ্য পার্শ্ববর্ত্তী বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিল। তাহারা আসিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে কৃষ্ণবর্ণ, তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রধারী পুরুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুকালে অগ্নি ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়া নূতন ভাষায় গম্ভীর শব্দে কি বলিয়া গেল। সেই শব্দমালার গাম্ভীর্য্য এত অধিক যে, আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েক জন ভীত হইয়া পলায়ন করিল। শ্বেত-কৃষ্ণ মনুষ্যের বিবাদের ফলে আমি অগ্নির আলোক দর্শন করিলাম। পরে কতবার সেরূপ আলোক দেখিয়াছি, কতবার উজ্জ্বলতর অগ্নি আমার নিকট প্রজ্বালিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম সে আলোকদর্শনে যে আনন্দ তাহা পরে আর অনুভব করি নাই। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজতশুভ্রবর্ম্মাবৃত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী শ্বেত-কায় সৈনিকগণ দলে দলে আসিয়া ভস্মরাশি বেষ্টন করিয়া ফেলিল—বিলাপে পর্ব্বতের সানুদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে সৈনিকবর্গ কাষ্ঠ অন্বেষণে চলিয়া গেল। কেবল কয়েকজন মাত্র মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে চিতাধূম গগন স্পর্শ করিল, অরণ্যবাসী শ্বেতকায় মনুষ্যগুলির দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিগুলি একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময় পাত্রে রক্ষিত হইল, দলে দলে শ্বেতকায় মনুষ্য আসিয়া তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে একটি গুরুভার দণ্ডের সহিত ভস্মাধারটি ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। ইহার পর কয়েক দিবস চারি পার্শ্বের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে গভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইত। শুনিতে পাইতাম কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যজাতির শোণিতে পর্ব্বতের সানুদেশ রঞ্জিত হইতেছে, ভীষণ

প্রতিহিংসার প্রাবল্যে শ্বেতকায় সৈনিকগণ কৃষ্ণকায় জাতির ধ্বংসসাধন করিতেছে, বৃদ্ধ ও বালক, স্ত্রী ও পুরুষ দলে দলে নিহত হইতেছে, পর্ব্বতের উপত্যকাগুলি ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। বায়ু আসিয়া ভস্মরাশিকে উড়াইয়া লইয়া গেল, ভস্মসিঞ্চিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হইল, অতি অল্প-কালের মধ্যে উপত্যকা আবার স্নিগ্ধশ্যাম বনরাজিতে আবৃত হইল। ইহার পর আমরা আর সর্ব্বদা মানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না, কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা অতি সাবধানে মৃগয়া করিতে আসিত, অধিক সংখ্যক কৃষ্ণকায় মনুষ্য আর কখনও দেখি নাই। কখন অরণ্যবাসী জটাশ্মশ্রুধারী পুরুষ-গণ সমিধপুষ্পাহরণের জন্য গভীর বনে আসিতেন, কখন বা প্রতিহিংসা-পরবশ কৃষ্ণকায় অলক্ষ্যে শ্বেতকায় বনচারীর পশ্চাদ্‌গমন করিত। কিন্তু সে পর্ব্বতের সানুদেশে বা উপত্যকায় বহুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের বাস ছিলনা।

শুনিয়াছি, ক্রমে শ্বেতকায় মনুষ্যে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, কৃষ্ণকায় মানবজাতি ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল; যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া নবাগত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল ও ক্রমে শ্বেত জনসঙ্ঘে মিশিয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ জনগণের চরম উৎকর্ষের অবস্থা দেখি নাই। আমি যখন পুনরায় মনুষ্যসমাজের সংসর্গে আনীত হইয়া-ছিলাম, তখন শ্বেতকায় জাতির অবনতি সূচিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এই জাতির যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল; এতদ্দেশবাসী অপর কোন জাতিরই সেরূপ হয় নাই। তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা হর্ম্ম্যাবলী সুদৃশ্য চিত্রশোভিত করিত; ক্রমে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পর্ব্বত-গাত্র ছেদন করিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য পাষাণ লইয়া যাইত, অস্ত্রসাহায্যে তাহার মলিনত্ব দূর করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিত। তাহারা কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে জলরাশি উত্তীর্ণ হইত, বৃহদাকার কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে

বর্ত্তুলাকার কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বনবাসী জীব-সমূহকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত। যে ব্যক্তি বর্ত্তুলের পরিবর্ত্তে রথে চক্র যোজন করিয়াছিল তাহার নাম অদ্যাপি তোমরা করিয়া থাক। ক্রমে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ও কৃষ্ণকায় জাতির সহিত মিশ্রণে তাহাদের বর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন মনুষ্যসমাজে নীত হইলাম তখন দেখি-লাম, নবাগত জাতির বর্ণের বৈষম্য ঘটিয়াছে, আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বলেরও লাঘব হইয়াছে।

বহুকাল পরে পার্শ্বদেশে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিলাম। শুনিয়াছি, পাষাণ যে ক্লেশ অনুভব করে তাহা তোমরা এখন স্বীকার কর। দেখিলাম, মলিনবেশধারী জনৈক মনুষ্য আমার পার্শ্বে লৌহকীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর, অনেকগুলি কীলক ভগ্ন হইবার পর একটি কীলকের কিয়দংশ আমার পার্শ্বে প্রবেশ করিল। আমার যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই, বোধ করিবার ক্ষমতা নাই, সমস্ত ঘটনা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি বলিতে পারি, এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা কখনও ভোগ করি নাই; এরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা সমুদ্রগর্ভে বাসকালে মূর্চ্ছার প্রারম্ভেও বোধ হয় অনুভব করি নাই; পরবর্ত্তী জীবনে একবার মাত্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, পর্ব্বতের নানা স্থানে মনুষ্যগণ কীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; দারুণ যন্ত্রণায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। একটি, দুইটি, তিনটি, ক্রমে দশটি কীলক সমরেখায় প্রোথিত হইল। আমাদিগের আক্রমণকারী লৌহদণ্ডধারী আরও কয়েকজন মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া আনিল। কীলকমূলে লৌহদণ্ড প্রয়োগে ও মনুষ্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় আমরা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেলাম। আমাদিগকে অপ-

সারিত করিয়া আততায়ীরা পুনরায় কীলক প্রোথিত করিতে লাগিল। ক্রমে পর্ব্বতের সানুদেশে সমস্ত স্থান হইতেই এই নিষ্ঠুর বিদারণের শব্দ আসিতে লাগিল; আমরা জানিতে পারিলাম যে, উপত্যকার সর্ব্বস্থানেই পাষাণের উপর অত্যাচার হইতেছে। এইরূপে সন্ধ্যাগমের পূর্ব্বেই পর্ব্বতসানুর আকার অন্যরূপ হইয়া গেল। অন্ধকারের আগমনের সহিত চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত হইতে লাগিল, বনভূমি বহুকাল পরে মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরে জানিয়াছিলাম, স্তূপনির্ম্মাণের জন্য নগর হইতে সহস্রাধিক ব্যক্তি পাষাণ ছেদন করিতে পর্ব্বতের নিকটে আসিয়াছিল। তাহারা সমস্ত দিন পাষাণ ছেদন করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে রাত্রিযাপন করিত। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যার সমাগম পর্য্যন্ত পাষাণ ছেদনের শব্দে ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে শৈলশ্রেণী কম্পিত হইত। শ্বাপদসঙ্কুল বনাবৃত সানুদেশ জীবশূন্য হইয়া উঠিল। মানবগণ মাসদ্বয় পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে শিলাছেদনে ব্যাপৃত ছিল। শিলাছেদন শেষ হইলে নগর হইতে শত শত গোযান আসিয়া উপস্থিত হইল; গোযান যাতায়াতের জন্য উপত্যকা হইতে নিম্নভূমি পর্য্যন্ত পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল। দলে দলে বৃহৎকায় হস্তিগণ পর্ব্বতনিম্নে আনীত হইল ও দিনের পর দিন হস্তিগণ বৃহৎ পাষাণখণ্ডসমূহ শুণ্ডে উঠাইয়া গোযানে স্থাপন করিতে লাগিল।

দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে হীনবল মানবজাতি কিরূপে এই গুরুভার পাষাণরাশি পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহু দূরবর্ত্তী নগরের সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছিল, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গুরুভার পাষাণ কিরূপে ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তোমরা বিস্মিত হও, কিন্তু আমি তখন আশ্চর্য্যজনক বিশেষ কিছুই দেখি নাই। আমি কিসে বিস্ময়

বোধ করি শুনিবে? আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল গোশকট দেখিয়া, গোশকটের চক্র দেখিয়া, চক্রের প্রবর্ত্তন দেখিয়া। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চক্র গুরুভার পাষাণের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না; ভারবহনেও যদি সমর্থ হয়, শকট চলিতে সমর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদ ঘটিবে। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই শকট চলিল, চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পথ অতি-বাহিত হইতে লাগিল। সেরূপ গোশকট তোমরা এখন আর ব্যবহার কর না, দুই একজন মাত্র, তাহার পাষাণে খোদিত চিত্র দেখিয়া থাকিবে। তাহা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত গোশকটের ন্যায় নহে। বর্ত্তমানের গোশকট দ্বিচক্র, কিন্তু সেগুলি চারি বা ততোধিক চক্রের উপরে স্থাপিত হইত। রথচক্র কোন স্থানে ভূমিতে প্রবেশ করিলে বা পথের কোন স্থান কর্দ্দমাক্ত থাকিলে হস্তিবৃন্দ আসিয়া সাহায্য করিত, শুণ্ডে রথচক্র মুক্ত করিত, কখন বা ভারবাহী গোসমূহকে সাহায্য করিত। এইরূপে গোশকটে সহস্রাধিক শিলাখণ্ড নূতন পথ ধরিয়া শতাধিক যোজন পথ আনীত হইল। শিলাবাহী শকট সমূহ যেদিন নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, সে দিন নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। দলে দলে নগরবাসিগণ আসিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ দীর্ঘকায় প্রস্তর পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই; তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে শকটশ্রেণী নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। ক্রমে পথরোধ করিয়া ফেলিল। মুষ্টি-মেয় রাজপুরুষের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল না; তখন অতি বৃদ্ধ, লোলচর্ম্ম, মুণ্ডিতশীর্ষ কাষায়বস্ত্র-পরিহিত একজন মনুষ্য আসিয়া ভগবান বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিয়া পথ মুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধের ও

রাজপুরুষগণের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল। শকটসমূহ নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নগরপ্রাকারের বাহিরে এক প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইল।

এই সময়ে দেখিলাম, মনুষ্যজাতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; অনেক উন্নতি হইয়াছে, অনেক বিষয়ে অবনতিও হইয়াছে। নূতন নাম, নূতন আচারব্যবহার, নূতন অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী আসিয়া আমার পূর্ব্ব পরিচিত শ্বেতকায় জাতিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। বুদ্ধ, স্থবির, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, সঙ্ঘারাম, চীবর, কাষায় প্রভৃতি কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। মনুষ্যজাতির আবাসস্থল নগরসমূহ সুদৃশ্য গগনস্পর্শী আবাসভবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে; রাজপথ সমূহ প্রস্তরাচ্ছাদিত হইয়াছে, বিশাল নগরে জলাভাব দূর করিবার জন্য কৃত্রিম নদীসমূহ খনিত হইয়াছে; হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি জীবগণ নরজাতির বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে বহন করিতেছে; উষ্ট্র ও অশ্ববাহিত শকটের শব্দে শ্রুতিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; নগরমধ্যে জলপথে বিচিত্র তরণীসমূহ ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। আমি এরূপ নগর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, ক্রমে হস্তিযূথের সাহায্যে শকট হইতে প্রস্তরসমূহ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সমুদায় প্রস্তর নামাইতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। শকটের পশ্চাতে যে বিশাল জনসঙ্ঘ প্রান্তরে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে নগরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

ক্রমে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। পূর্ব্বে নগর ও নাগরিক কখনও দেখি নাই। সেদিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কথোপকথন কর্ণগোচর হইয়াছিল; তাহার কতক বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কতক পারি নাই। তবে এইমাত্র নিশ্চয় জানিয়াছিলাম যে, মানবজাতির ভাষার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে কৃষ্ণকায় বনবাসী মানবজাতির মুখে যে

ভাষার প্রয়োগ শুনিয়াছিলাম, সে ভাষার অবিমিশ্র প্রয়োগ আর শুনি নাই। পূর্ব্বে নবাগত শ্বেতকায় জাতির মুখে যে ভাষা শুনিতাম, সে ভাষাও আর শুনি নাই। এখন নাগরিকগণকে যে ভাষা ব্যবহার করিতে শুনিলাম, তাহা প্রাচীন শ্বেতকায় জাতির ভাষার ন্যায়, কিন্তু সেরূপ পুরুষ নহে, তাহা অপেক্ষাকৃত কোমল ও সুশ্রাব্য।

বহুকাল পরে মনুষ্যজাতি দেখিলাম। আমি বৃদ্ধ,—অতি বৃদ্ধ; আমার বয়সের পরিমাণ করিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, আমার বয়স শুনিয়া তোমরা বিস্মিত হইতে। বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে; নগরবাসী মনুষ্যজাতিকে কি প্রকার দেখিলাম তাহা বলিতেছি, তুমি চিত্ত সংযত কর, আমার প্রগল্‌ভতায় বিরক্ত হইও না। শকটবাহিত পাষাণ দেখিতে নানাবিধ মনুষ্য আসিয়াছিল। যাহারা রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও বালক, শ্বেত ও কৃষ্ণ, সর্ব্ববিধ মনুষ্যই দেখিয়াছিলাম। যাহারা আমাদিগকে ছেদন করিতে পর্ব্বতপার্শ্বে গমন করিয়াছিল, তাহারা শ্রমজীবী, কঠোর পরিশ্রমে পটু, পরুষভাষী, বহুভাষী ও বহুভোজী। শকটে প্রস্তর আসিতেছে শুনিয়া যাহারা নগরপ্রান্তে আমাদিগকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই শ্রমজীবী, তবে তাহাদিগের মধ্যে দুই একজনকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা যেন অপর কোন জগতের মনুষ্য, তাহাদিগের সুদীর্ঘ বপু ও কোমল মুখকান্তি দেখিয়া- মনে হইয়াছিল, যেন তাহারা কঠোর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নহে। তাহারা সুদৃশ্য বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; তাহারা যে স্থান দিয়া চলিয়া যায় সে স্থান সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে; তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ যেন আলস্যজড়িত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা বিলাসপ্রিয় নাগরিক। নগরপ্রাকার অতিক্রম-

কালে আর এক শ্রেণীর মনুষ্য দেখিয়াছিলাম; তাহারা দীর্ঘকায়, সুদর্শন, কোমল অথচ কঠোর; তাহারা পরিচ্ছদের উপর লৌহবর্ম্ম ধারণ করিয়াছিল, কোমল হস্তে শাণিত লৌহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বলদীপ্ত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী। পূর্ব্বে যে শ্বেতকায় জাতি দেখিয়াছিলাম, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করিত, তাহারাই দেবসেবা করিত, তাহারাই হলকর্ষণ করিত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বিলাসিতা ছিলনা। বর্ত্তমানকালে এ কথা তোমাদিগের নিকট শ্রুতিকঠোর হইবে। সহস্র সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া তোমরা জাতিভেদ—জাতি অনুসারে কর্ম্মভেদে অভ্যস্ত, সুতরাং এ কথা তোমরা হয় ত বিশ্বাস করিবে না। তোমাদিগের নিকটে তোমাদিগের প্রাচীন প্রথার অবশেষ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে তোমরা জানিয়া আসিতেছ যে, জাতিভেদ বহুকালের। কিন্তু আমি জাতিভেদ অপেক্ষাও প্রাচীন, আমি মনুষ্য-জাতি অপেক্ষা প্রাচীন, আমি সর্ব্বজীব অপেক্ষা প্রাচীন,—আমার কথা বিশ্বাস করিও।

নগর কাহাকে বলে তাহা সেই দিন দেখিলাম। দেখিলাম তাহা মনুষ্যের অরণ্যবিশেষ। যতদিন পর্ব্বতের পদপ্রান্তে পড়িয়া ছিলাম ততদিন দেখিয়াছি, জীব দেখিলে জীব হয় তাহার নিকট আসিয়া মিলিত হয়, নহে ত দূরে পলায়ন করে, হয় আলাপে প্রবৃত্ত হয়, নহে ত পরস্পরের প্রাণহরণের চেষ্টা করে। এত অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে এত অধিক জীব পরস্পর বিবাদ না করিয়া, হিংসা না করিয়া কিরূপে বাস করে, তাহা আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু শুনিয়াছি, বিবাদ ও হিংসার প্রকারভেদ হইয়াছে; যে স্থানে জীবের অস্তিত্ব আছে বিবাদ ও হিংসা এখনও সে স্থানে বিদ্যমান আছে।

যখন নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরমধ্যে গমন করিতেছিলাম তখন দেখিতেছিলাম, জনস্রোতঃ নানাপথ হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইতেছে। পরস্পর অভিভাষণ না করিয়া, এমন কি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া যে যাহার গন্তব্যপথে চলিয়া যাইতেছে। প্রথম দিন নগর দেখিয়া ইহা আমার নিকট একান্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। রাজ-পথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপনীশ্রেণী, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, বিপুল পণ্যের সমাবেশ প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। বিপনীর উপরে গবাক্ষপথে শকটশ্রেণী-দর্শনলোলুপা অবগুণ্ঠনশূন্যা অন্তঃপুরিকাগণকেও দেখিয়াছিলাম! ইহার পূর্ব্বে কখনও এত অধিক স্ত্রীলোকের একত্র সমাবেশ দেখি নাই। সে দিন কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত বেশবৈচিত্র দেখিয়াছি তাহা আর কি বলিব! শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রথম নগর দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, সেরূপ আনন্দ আর কখনও উপভোগ করিব কি না সন্দেহ। আমাদিগকে দেখিতে নগরের প্রায় সমুদায় লোকই আসিয়াছিল; রাজাও আসিয়াছিলেন, তিনি নগরের মধ্যভাগে অষ্টাশ্বযোজিত স্বুবর্ণনির্ম্মিত রথারোহণে আসিয়া-ছিলেন। অশ্বারূঢ় রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসিগণ আনন্দধ্বনি করিতেছিল; বাতায়নপথে নাগরিকাগণ পুষ্প ও লাজ বৃষ্টি করিতেছিল। রাজসমাগম যেন একটি স্বতন্ত্র উৎসব হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপথে দেখিয়াছিলাম, সুন্দরী রমণীগণ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নাগরিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহাদিগের আকার-ইঙ্গিত, আচার-ব্যবহার তখন আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। পরে শুনিয়াছি তাহারা বারাঙ্গনা।

নগর অতিক্রম করিয়া দেখিয়াছিলাম, নগরপ্রাকারের বহির্ভাগে সুসজ্জিত পুষ্পবাটিকা সমূহ নরনারীতে পরিপূর্ণ। বিবিধবর্ণে রঞ্জিত, নানা আভরণে ভূষিত সুন্দরীগণের কলহাস্যে নগরোপকণ্ঠ যেন নূতন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আসবপানে ঈষদ্‌রক্ত আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন কটাক্ষপাতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেরূপ বিলাস-বিহ্বল দৃষ্টি পরে আর কখনও দেখি নাই। যাহারা কাদম্ব পান করিত, তাহাদিগের কাদম্বের সহিত তাহারাও অন্তর্হিত হইয়াছে। লোকে নিত্য যাহা দেখিয়া থাকে, তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যাহা নূতন দেখে তাহা দেখিয়া যেন তৃপ্তি হয় না। নগর, নাগরিক, নাগরিকা, উপনগর, পুষ্পবাটিকা, উৎসব সকলই তখন আমার নিকট নূতন। সে দিন যেভাবে মনুষ্যজাতিকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে কখনও সে ভাবে দেখি নাই, আর কখনও সে ভাবে দেখিব না। যখন পর্ব্বতের সানুদেশে ছিলাম, তখন দেখিতাম সন্ধ্যাগমে বনরাজি নিঃশব্দ হইত। যে দিন চন্দ্রোদয় হইত না, সেদিন খদ্যোতের আলোকে পর্ব্বতমালা ভীষণ বোধ হইত। নগর দেখিয়া আমার সেই কথা মনে হইত। আমরা যে প্রান্তরে পড়িয়া ছিলাম, সন্ধ্যাগমে সেই স্থান হইতে দেখিতাম, দূরে বিশাল পর্ব্বতমালার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সৌধশ্রেণীর অস্পষ্টমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, পর্ব্বতগাত্রে খদ্যোত-শ্রেণীর ন্যায় নগরে অসংখ্য দীপশ্রেণী প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। দীপ-কাহাকে বলে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। অগ্নির আলোক দেখিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে দীপালোক দেখি নাই। দূর হইতে স্নিগ্ধ দীপালোক স্নিগ্ধতর বোধ হইত। নিশাগমে নগরের নানা স্থান হইতে গীতবাদ্যের রব আসিত। ক্রমে নদীবক্ষে দুই একখানি তরণী দেখা যাইত; ক্ষুদ্র

তরণীতে যুবক যুবতী একত্র নৈশ বায়ু সেবনে নির্গত হইয়াছে ; যুবতী গান গাহিতেছে, যুবক ক্ষেপণি চালনা করিতেছে। কোন কোন বৃহদাকার তরণীতে বিলাসীরা আসবোন্মত্তা বারনারী পরিবৃত হইয়া কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহাদিগের আমোদ-প্রমোদ, আশা-ভরসা সুখ-দুঃখ লইয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে ; কেবল সুদূর অতীতের সাক্ষিরূপেই যেন আমাকে রাখিয়া গিয়াছে।

[২]

পরদিন প্রাতঃকালে, পূর্ব্বে যে বৃদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলিয়াছি, তিনি আসিয়া নগরের প্রধান ব্যক্তিগণকে প্রান্তরে সমবেত করিলেন। পরে ক্রমশঃ রাজা ও তদ্বংশীয় ব্যক্তিগণও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বৃদ্ধ সেই জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"আমি ত্রিংশদ্বর্ষ পূর্ব্বে আমার জন্মভূমি মগধ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বাল্যকালে আমি মহারাজ প্রিয়দর্শীকে রাজগৃহের পথে দেখিয়াছি; কিন্তু সে কথা আমার ভাল স্মরণ হয় না। যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ও যে ধর্ম্মের জন্য তিনি বৃদ্ধাবস্থায় গিরিব্রজের বনমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম তখন বিশেষ সমাদৃত। তখন পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পশ্চিমে কপিশা পর্য্যন্ত ও উত্তরে খশদেশ হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। তাঁহার চেষ্টায় যে প্রবল ধর্ম্মলিপ্সা সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত দেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই জন্য বিংশতি-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মাশোকের মৃত্যুর পর দশরথ, সঙ্গত, শালিশুক প্রভৃতি রাজগণ তাঁহার সযত্ন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। উত্তরপশ্চিমকোণে গান্ধার, উদ্যান, কপিশা, বাহ্লীক প্রভৃতি প্রদেশে এই ধর্ম্মের এতদূর উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল যে, বিজেতৃ যবনগণও আসিয়া তথাগতের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে যবন রাজা অন্তর্ব্বেদী অতিক্রম করিয়া সাকেত অবরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা শতবর্ষপূর্ব্বে,

স্বর্গগত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শ্বশুরবংশের অধীনে বাহ্লীক ও কপিশার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যে আন্তিয়োক সপ্তসিন্ধু বিজয় করিতে আসিয়া সৌভাগ্যসেনের নিকট হইতে পঞ্চশত সংখ্যক হস্তিযুথ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে ঐরাণে পারদগণ ও বাহ্লীকে বিদ্রোহী যবনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ক্রমে শক জাতির তাড়নায় ইহারা পূর্ব্বদিকে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। বাহ্লীকের যবনরাজ্যের অভ্যুত্থানের সহিত গান্ধারে ও উদ্যানে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের মর্য্যাদাহানি আরব্ধ হইয়াছে। ইহাই মৌর্য্যরাজবংশের ও সদ্ধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত। বাল্যে আমি হিরণ্যবহা তীরে পাষাণ-নির্ম্মিত কুক্কুটপাদবিহারে বাস করিতাম। তখন শ্রমণাচার্য্যগণ ঐরাণ, বাবিরুষ, মিশর ও যবন দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সদ্ধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। তখন নগরে প্রতিদিন মহোৎসব হইত। সদ্ধর্ম্মের সেরূপ উন্নতির দিন আর বোধ হয় আসিবে না। ধর্ম্মের এরূপ দুরবস্থা চিরকাল ছিল না, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য আমি এই শতবর্ষের পুরাতন কাহিনীর পুনরবতারণা করিতেছি। তখন শ্রমণ দেখিলে আবালবৃদ্ধ, উচ্চ-নীচ সকলেই নতশীর্ষ হইত। পশ্চিমে নগরহারে, পুরুষপুর ও তক্ষশিলা, দক্ষিণে উজ্জয়িনী, বিদিশা, ও পূর্ব্বে চম্পা, পুলিন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষার্থিগণ পাটলিপুত্রে আসিত। আমি যৌবনে তাহাদিগের সহিত কপোতিক, পারাবত, কুক্কুটপাদ, মহাকৌণ্ডপীয়, মহাসাঙ্ঘিক প্রভৃতি বিহারে একত্র শিক্ষালাভ করিয়াছি। তখন শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ প্রবাসে যাইতে হইলে অন্ধকারের আশ্রয়ে বনান্তরালের পথ গ্রহণ করিতেন না; পরন্তু বঙ্গ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত রাজপথ বৌদ্ধগণের ব্যবহার্য্য ছিল—ইহা কল্পনা

নহে। যে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মাশোকের শাসনকালে যজ্ঞকালীন পশুবধ হইতে রাজভয়ে বিরত হইয়াছিল, যাহাদিগকে প্রিয়দর্শী দেবপদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমশঃ সোমশর্ম্মা, শতধন্বা প্রভৃতি দুর্ব্বল রাজগণের রাজত্বে পুনরায় মস্তকোত্তলন করিতে লাগিল। মৌর্য্যসাম্রাজ্য ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্যমধ্যে অহিচ্ছত্রবাসী মিত্রোপাধিধারী সুঙ্গবংশ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তর্ব্বেদীর উত্তরস্থ প্রাচীন অহিচ্ছত্রনগরী ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। পুরুষ পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে, অহিচ্ছত্র নগরে বা মণ্ডলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ, তথায় তথাগতের ধর্ম্মের স্থান নাই। সুঙ্গবংশীয়গণ ব্রাহ্মণগণের শিষ্য ও সদ্ধর্ম্মের বিরোধী। যেদিন পাটলীপুত্রনগরপ্রাকারের বাহিরে বিশ্বাসঘাতক পুষ্যমিত্র বলদর্শন ব্যপদেশে শেষ মৌর্য্যরাজা বৃহদ্রথকে সংহার করিল, প্রাচীন ভিক্ষু বা যতিমাত্রেই সেই দিন বলিয়াছিলেন যে, এতদিনে সদ্ধর্ম্মের শুভদিনের অবসান ও দুর্দ্দিনের সূচনা হইল। কে জানিত দশ বৎসরের মধ্যে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সহিত মাগধ সঙ্ঘেরও বিলোপ হইবে? বৃহদ্রথের মৃত্যুর অত্যল্পকাল মধ্যে দুষ্ট ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে নাগরিকগণের উন্নতির ও শিক্ষার জন্য আমরা জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, সেই কৃতঘ্নগণই আমাদিগের ধ্বংসসাধনে তৎপর হইল। যে কারণে আমি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া, পুণ্যক্ষেত্র মগধ ত্যাগ করিয়া মহাকোশলের অরণ্য মধ্যে তোমাদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই কারণেই নগরবাসী জনৈক ভিক্ষু তথাগতের ভিক্ষাপাত্র লইয়া পুরুষপুর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাক্যরাজপুত্রের উষ্ণীষ কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সযত্ন সংগৃহীত বুদ্ধদেবের ভস্মরাশি পাটলীপুত্রের রাজপথের ধূলিরাশির সহিত মিশ্রিত

হইয়াছে। কপোতিক সঙ্ঘারামের মহাস্থবিরের ছিন্নশীর্ষ দক্ষিণ নগরদ্বারে কীলকবদ্ধ হইয়া আছে।

মগধে সদ্ধর্ম্মের নাম—তথাগতের নাম লোপ পাইয়াছে। যাহারা এখনও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া থাকে, দশশীল বিস্মৃত হয় নাই, ভিক্ষু ও শ্রমণগণকে ভক্তি করে তাহারাও প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয়ে আছে। সদ্ধর্ম্মের লোপের সহিত স্তূপ, গর্ভচৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতিরও লোপ হইতেছে। উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, স্থবির-স্থবিরাগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তথাগতের ধর্ম্ম সাধারণ লোকে ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছে, এখনও যাঁহাদের স্মরণ আছে তাঁহারাও মন্দিরবিহারাদির অভাবে যথারীতি উপাসনা করিতে পারেন না। মথুরা হইতে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত ও শ্রাবস্তী হইতে বিদিশা পর্য্যন্ত বৌদ্ধমন্দির, বিহার প্রভৃতির চিহ্নও দেখা যায় না। আমি বিংশতিবর্ষকাল চেষ্টা করিয়া এই নগরে বিদিশার সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের ভস্মস্তূপের অনুরূপ, একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদিগের সংখ্যার এত হ্রাস হইয়াছে যে, একটি স্তূপ নির্ম্মাণের ব্যয় সংগ্রহের জন্য আমাকে পাটলীপুত্র হইতে বিদিশা পর্য্যন্ত সকল নগরবাসীরই সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। যখন পুষ্যমিত্রের অত্যাচারে মগধ ত্যাগ করিয়া মহাকোশলে আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন তোমাদিগের বর্ত্তমান রাজার পিতা অগরাজু সিংহাসনে আসীন ছিলেন। চিরকাল এই রাজবংশ তথাগতের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, সদ্ধর্ম্মের এই দারুণ দুর্দ্দিনেও ইহাঁদিগের বিশ্বাস অচল রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকের উৎপীড়িত প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল, এই রাজ্যে এতদিন পরে স্তূপ ও মন্দির নির্ম্মাণের উপায় হইল। শুনিয়াছি,

মথুরায় সদ্ধর্ম্মের অনুচরগণ একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তোমাদিগের রাজা ধনভূতি মথুরাবাসীদিগকেও অর্থসাহায্য করিতেছেন ও সেই সাহায্যে স্তূপ-বেষ্টনীর কয়েকটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে। মহারাজের আনুকূল্যে তোমাদিগের স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ তোরণ-চতুষ্টয় নির্ম্মিত হইবে। অবশিষ্টাংশের ব্যয় প্রকৃতবিশ্বাসীগণ বহন করিবেন। ভরসা করি, সদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থান ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পতন হইবে। যে অশ্মরাশি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা দ্বারা নির্ম্মিত গগনস্পর্শী স্তূপ আচন্দ্রার্কক্ষিতি সমকাল সদ্ধর্ম্মের উন্নতির সাক্ষীরূপে বিরাজ করিবে।"

এই সময়ে নগরের দিকে রাজপথে ধূলি উত্থিত হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট হইল জনৈক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে আমাদের দিকে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে জানা গেল সে ব্যক্তি একজন নগররক্ষী; নগরে পশ্চিম দেশবাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমন সংবাদ রাজসমীপে নিবেদন করিতে আসিয়াছে। রাজা ও পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ, সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই, নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দিন বৃদ্ধির সহিত প্রান্তরে জন-সংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল; দ্বিপ্রহরকালে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল।

পরদিন প্রত্যূষে রাজা ধনভূতি, বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও নগরের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি অভিনব পরিচ্ছদধারী চারিজন বিদেশীয়কে সঙ্গে লইয়া শিলাসঞ্চয়স্থলে উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সে জাতীয় মনুষ্য দেখি নাই। যবন সমাগমে ভারতের যখন সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছিল, তখন আমি পর্ব্বতসানুদেশে—অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায়। তাহাদের কথা আমি দূরে শুনিয়াছি। সেই প্রথম যবন দর্শনের দিনে তাহাদিগকে দেখিয়া যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। দারিদ্র্য-

পীড়িত হইলেও যেমন লাবণ্য উপলব্ধি করা যায়, ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও যেমন অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায়, সেইরূপ ভারতীয় পরিচ্ছদ ও ভাষা সত্ত্বেও স্পষ্ট বোধ হইতেছিল যে, তাহারা বিদেশীয়। তাহাদিগের নাম ও রূপাকৃতি ব্যতীত তাহাদিগের যবনত্বের আর সমুদায় নিদর্শনই লুপ্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের পরিচ্ছদ শীতপ্রধান দেশোপযোগী, তাহারা গান্ধার ও মদ্রদেশে ব্যবহৃত পশুলোম নির্ম্মিত বস্ত্র ও গাত্রাবরণ পরিধান করিয়াছিল ; তাহাদিগের বস্ত্র অতি মলিন, অত্যন্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। প্রথম প্রহরে যখন সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহারা স্বেদপরিপ্লুত হইলে দুর্গন্ধের ভয়ে রাজা দূরে গমন করিলেন। তাহাদের নামগুলিও বিস্ময়কর যথা,—কিলিকীয় মাথেতা, অলসন্দবাসী লিওনাত, ঔত্থানক থৈদোর এবং কপিশাবাসী আত্তিমিদর। পরে জানিয়াছি, অলসন্দ নগরে শাকেতবিজয়ী যবনরাজ মেনন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে খোদন ও তক্ষণ শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হইত। তাহা হইতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্পের সামান্য জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। সে কথা পরে যথাসময়ে বলিব।

রাজা আসিয়া তাঁহার চিরপোষিত আশা অনুসারে সেই প্রান্তর মধ্যে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতীরে স্তূপনির্ম্মাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পরিশেষে যবনগণের পরামর্শ অনুসারে নদী হইতে অল্প দূরে স্তূপ নির্ম্মাণ করাই স্থির হইল। তখন একে-একে, দুইয়ে-দুইয়ে মুণ্ডিতশীর্ষ চীরধারী ভিক্ষুগণ নগর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুগণ স্থবির ধর্ম্মযাজকের পশ্চাদ্দেশে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, নগর হইতে আনীত সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি প্রান্তরে স্তূপীকৃত হইল। রাজা, রাণী ও রাজপুত্র বাধপাল, ধর্ম্মযাজকের

উপদেশানুসারে ধরিত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপে পূজা করিলেন। রাজবংশ-ধর নিক্ষিপ্ত সেই পুষ্পমুষ্টির উপরে সমবেত জনসাধারণ ক্রমাগত পুষ্পবৃষ্টি করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্তূপের স্থষ্টি করিল। বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক তথন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, তথাগতের বাক্যানুসারে সমুদায় স্তূপ ও গর্ভচৈত্যই অর্দ্ধ-বৃত্তাকার ও তৎসমুদায়ের উচ্চতা নৈমদৈর্ঘ্যের সমান। তথন ধর্ম্মযাজকেরা পুষ্প লইয়া সেই কুসুমস্তূপের পার্শ্বে পত্র ও পুষ্পদ্বারা গোলাকার বেষ্টনী নির্দ্দেশ করিলেন এবং পুষ্প, চন্দন ও জলদ্বারা স্তূপের অর্চ্চনা করিলেন। ইহার পর রাজা ধর্ম্মযাজকগণ পরিবৃত হইয়া সপ্তবার স্তূপ প্রদক্ষিণ করিলেন। ক্রমে সূর্য্যতাপতাড়িত হইয়া জনসমূহ নগরাভিমুখে চালিত হইল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে, অন্ধকারাগমের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ভীত-চকিত পাদক্ষেপে দুইজন লোক আমাদের সমীপে আসিল। তাহারা বিদেশীয় নহে, ভারতীয় বটে; কিন্তু যেন বন্য জন্তুর ন্যায় অন্ধকারের আশ্রয়ে ভ্রমণ করে। তাহারা যেন মানবজাতির অধিকারচ্যুত হইয়া নিশাচরে পরিণত হইয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণজাতীয়, ঈর্ষ্যায় তাহাদিগের কলেবর কম্পবান, রোষে তাহাদের নেত্র রক্তবর্ণ; আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা মুখের ভাবে ও কথোপকথনে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের আশা-ভরসা, সুখ-সম্পদ সকলই দূর হইয়া গিয়াছে। সুদিন প্রত্যাবর্ত্তনের যে আশা ছিল তাহাও যেন এই প্রস্তররাশির আগমনে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। অসহায় প্রস্তররাশির উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ও পদাঘাত করিয়া তাহাদিগের মনুষ্যপদলোপের পরিচয় দিতে লাগিল। তাহাদিগের কথোপকথনে জানিলাম যে, বহুপূর্ব্বে সে দেশে ব্রাহ্মণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের প্রথম মর্য্যাদাহানি

হয়, তাহার পর ব্রাহ্মণগণ আর কখনই পূর্ব্বগৌরবলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তবে পুষ্যমিত্রের রাজত্বলাভের পর হইতে বৌদ্ধপ্রভাবের হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু সে অত্যল্প কালের জন্য। পাটলিপুত্রবাসী বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের আগমন-কাল হইতে ব্রাহ্মণগৌরব পুনরায় তিরোহিত হইয়াছে। তাহারা যতবার সেই বর্ষীয়ান যাজকের নাম গ্রহণ করিল, ততবারই ভূমিতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, তাহারা যেন আর কোন প্রকারে সম্যক্ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিয়ৎকাল পরে দূরে নগররক্ষিগণের পদশব্দ শ্রবণে তাহারা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে যবনচতুষ্টয় অসংখ্য শ্রমজীবী সমভিব্যাহারে প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রমজীবিগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। একভাগ প্রস্তর সমূহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত পর্ণকুটীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল ; অপর ভাগ ভূমিতে গর্ত্ত খনন আরম্ভ করিল ও তৃতীয় ভাগ সঞ্চিত শিলাখণ্ড সমূহ আকারানুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে লাগিল। সেই দিন অপরাহ্নে একজন যবন মসৃণ চর্ম্মখণ্ড, মসী ও লেখনী লইয়া চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল। যথাসময়ে চিত্রাবলী প্রস্তুত হইলে স্থবির ধর্ম্ম-যাজক আসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যবনগণ কোশলের ও উদ্যানের ভাষা মিশ্রিত করিয়া আপনাদের বক্তব্য তাহাকে বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে অঙ্কিত চিত্র রাজার অনু-মোদিত হইল। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদেরই খণ্ডিত দেহ-সমূহ শতধা বিভক্ত হইয়া, সহস্র সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া যেরূপ শ্রেণী-বিন্যাসে ন্যস্ত হইবে এই চিত্রাবলী তাহারই। যথাসময়ে পর্ণশালা নির্ম্মিত হইল, আমাদের উৎপীড়ন আরব্ধ হইল। পাষাণদেহে যদি শোণিত থাকিত তাহা হইলে আমাদিগের শোণিত-প্রবাহে কোশল হইতে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত

সমগ্র ভূভাগ প্লাবিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে লীন হইত। পাষাণের যদি শ্রবণ-স্পর্শী আর্ত্তনাদের ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমাদিগের আর্ত্তনাদে হিমাচলের পদ কম্পিত হইত; আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ শব্দিত হইয়া উঠিত; তোমরাও বহুপূর্ব্বে আবিষ্কার করিতে যে, পাষাণেরও বেদনা অনুভব করিবার শক্তি আছে। জীবনের প্রারম্ভে সমুদ্রসৈকতে যে পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বালুকাকণা একত্র মিলিত হইয়াছিলাম, যাহাদিগের সহিত লক্ষ লক্ষ বর্ষ সমুদ্রগর্ভে, পর্ব্বত-সানুদেশে একত্র বাস করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে কত সহস্র কণা সুতীক্ষ্ণ লৌহের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারা এখন সেই প্রান্তরে বাস করিতেছে। সে প্রান্তর এখন উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, সে নদী শুষ্ক হইয়াছে, ও তাহার জলস্রোতঃ অন্য পথে প্রবাহিত হইতেছে। এখনও কোল ও মুণ্ডা জাতি হলকর্ষণকালে আমাদিগের উৎপীড়কদিগকে অভিশাপ দিয়া থাকে; কারণ, তাহাদিগের জন্যই দরিদ্র পার্ব্বত্য জাতির হল-ফলক অকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বেদনা দূর হইলে দেখিয়াছি, অসম প্রস্তরশ্রেণী সমান্তরালে স্থাপিত হইয়াছে; তাহা হইতে স্তম্ভ, সূচি, আলম্বন, তোরণ প্রভৃতি তোমরা যাহা কিছু দেখিয়াছ তৎসমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে; কেবল যথাস্থানে বিন্যস্ত হই-লেই হয়। দূরে রক্তবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তূপ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আচ্ছাদনখণ্ডসমূহের মার্জ্জনমাত্র অবশিষ্ট আছে। নগর হইতে প্রতিদিন দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ যবনশিল্পিগণের তক্ষণ-চাতুর্য্য দেখিতে আসিত। পরিষদ্ চতুষ্পাঠি ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ, আয়-তন হইতে শিশুগণ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত সেই পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়া থাকিত। সন্ধ্যাসমাগমে বিলাসিগণ রথারোহণে, হীনবিত্ত

নাগরিকগণ পদব্রজে, দলে দলে, নব খোদিত চিত্রাবলী দেখিতে আসিতেন। তাঁহাদিগের সহিত মিশ্র ভাষায় শিল্পিগণের কথোপকথন হইত, তাহা হইতে যাহা জানিতে পারিতেছি তাহাই বলিয়া যাইতেছি ;—

নাগরিকগণ বলিতেন যে, পারসিক-সমাগমের পূর্ব্বে এতদ্দেশে মন্দির বা স্তূপ নির্ম্মাণের প্রথা বা আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভারতীয় প্রথা অনুসারে দেবার্চ্চনার জন্য মন্দির বা স্তূপের প্রয়োজন হইত না। ব্রাহ্মণগণ পর্ব্বতে, বনে বা নদীতীর্থে যাজন করিতেন, উন্মুক্ত আকাশই তাঁহাদিগের মন্দির ছিল। যখন কপিশা হইতে বাহ্লীক ও উদ্যান পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমি পারসিক জাতির পদানত হইয়াছিল, তখন তাহাদিগেরই চেষ্টায় এতদ্দেশে দেবায়তন নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। তখন হইতে মূলস্থানপুরে মিত্র দেবের মন্দির, বরুণ পর্ব্বতে চন্দ্রের মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অবশ্য ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে তক্ষণ-শিল্প বহুলভাবে প্রচলিত ছিল, তবে ভাস্করগণ আপনাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রাচীর, স্তম্ভ, দুর্গপ্রাকার প্রভৃতির শোভাসংবর্দ্ধনে নিযুক্ত করিতেন। অদ্যাপি সেই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যপ্রথা স্তূপ ও মন্দিরবেষ্টন-শোভনকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারসিকেরা বভেরু বা বাবিরুষ ও নানাদেশীয় শিল্প এতদ্দেশে আনয়ন করেন। কিন্তু ভারতীয় ভাস্করগণ কখনই অবিমিশ্রভাবে বিদেশীয় ভাস্কর্য্য অবলম্বন করেন নাই। যখন ভারতবাসীকে বিদেশীয় জাতির নিকট নতশির হইতে হইয়াছে তখনই বিদেশীয়গণ বর্ব্বর হইলে পদানত জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত হইলে উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষার আদান প্রদান চলিয়াছে। যবনগণ ইহার উত্তরে কহিতেন যে, তাঁহারা পাষাণে মনুষ্যাকৃতি যথাযথ খোদিত করিতে পারেন। এই শিল্প তাঁহারা মিস্রাইম্ দেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার

পূর্ব্বে কোন জাতি এতদূর দক্ষতার সহিত পাষাণে জীবিত মনুষ্যের রূপাকৃতি গঠনে সমর্থ হয়েন নাই। মিস্রাইম্ দেশবাসিগণও মূর্ত্তিগঠনে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিলিকীয় মাখেতা কহিতেন যে, যবনদ্বীপপুঞ্জ ও মিস্রাইম্ দেশের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রকূলে কিলিকীয়া দেশে তাঁহার বাস। যৌবনে তিনি মিস্রাইম্‌বাসী ও আদিম যবন অধিবাসী উভয় জাতিই দেখিয়াছেন; কারণ, স্থলপথে যে সার্থবাহগণ নিগমবদ্ধ হইয়া উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই তাঁহার জন্মভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতেন, এতদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র যবন কিলিকীয়া দেশে বাস করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও তাহার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং বাহ্লীক বা গান্ধারবাসী যবন অপেক্ষা আদিম যবনদেশবাসী স্বজাতিগণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত অধিক। তিনি শুনিয়াছেন যে, অলিকসুন্দরের সহযাত্রিগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ অমূলক। তিনি দেশে শুনিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা প্রস্তর খোদনে নিপুণতার অভাবে দারুময় গৃহে বাস করে ও গৃহসমূহ কারুকার্য্যে শোভিত করে; কিন্তু তিনি এ দেশে আসিয়া দেখিয়াছেন যে, এ দেশে বহু প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহনগরাদি বিদ্যমান আছে ও ভারতবাসিগণ প্রস্তর-তক্ষণে বিলক্ষণ নিপুণ। পঞ্চনদবাসিগণ কাষ্ঠখোদনে অত্যন্ত নিপুণ এবং প্রস্তরানভাব সত্ত্বেও খোদিত কারুকার্য্যময় কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। নাগরিকগণ কহিলেন যে, পারসিক অধিকার কালে বাহ্লীক হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে ঐরাণদেশীয় ভাস্কর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ গৃহীত হইয়াছে ও ক্রমে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে স্তূপ নির্ম্মিত হইতেছে তাহার চারিটি তোরণ স্তম্ভের শীর্ষদেশে যে সিংহচতুষ্টয়

খোদিত হইয়াছে তাহা পারসিক ভাস্কর শিল্প-প্রভাবের অন্যতম ফল। কিলিকীয় মাথেতা ইহা স্বীকার করিয়া কহিলেন যে, স্তম্ভশীর্ষে জীবজন্তুর আকৃতির অনুসরণ প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে ছিল না। প্রাচীন মিজ্রাইম্ দেশীয়গণও স্তম্ভশীর্ষে প্রস্ফুটিত বা প্রস্ফুটনোম্মুখ পদ্মের অনুকরণ করিতেন। অলসন্দবাসী লিওনাত কহিলেন যে, প্রাচীন ভারতে চতুষ্কোণ বা অষ্টকোণ স্তম্ভ ব্যবহৃত হইত, অনুমান হয়। কারণ প্রাচীন হর্ম্ম্য-মাত্রেই এইরূপ স্তম্ভ দেখা যায়; গোলাকার স্তম্ভ অতীব বিরল। বাহ্লীক-নিবাসী যবনগণ যখন শকজাতির তাড়নায় পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন, যখন প্রাচীন বাহ্লীক রাজ্য চিরকালের জন্য ভারতীয়গণের হস্ত-চ্যুত হয়, তখন হইতেই ভারতে যাবনিক শিল্প-প্রণালীর সূচনা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অদ্যাবধি সুবস্তু নদীর দক্ষিণ তীরে প্রবেশ লাভ করে নাই। কোন একজন বিশিষ্ট নাগরিক কহিলেন যে, তাঁহার পিতা আনর্ত্ত দেশ হইতে পোতারোহণে ময়ূর বিক্রয়ের জন্য বভেরু নগরে গমন করিয়া-ছিলেন। তিনিও এই বাণিজ্যযাত্রায় আরব দেশ অতিক্রম করিয়া ধূপ ও গন্ধদ্রব্য আহরণের জন্য মিজ্রাইম্ দেশের দক্ষিণস্থ রাক্ষসগণের দেশে গিয়াছিলেন। সে দেশের অধিবাসিগণ দাক্ষিণাত্যবাসিগণের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও খর্ব্বাকার। মিজ্রাইম্বাসিগণ এই দেশকে পু-আহিত নামে অভিহিত করেন ও ভারতবাসী বণিকগণ উহাকে অপভ্রংশ করিয়া পুণ্য-নাম দিয়াছেন। এইরূপ কথোপকথনে দিবস অতিবাহিত হইত। সন্ধ্যাকালে শিল্পী, শ্রমজীবী ও নাগরিকগণ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কেবল শান্তিরক্ষকগণ খোদিত প্রস্তরের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য রাত্রিকালে প্রান্তরের মধ্যে বাস করিত। কারণ, একদা ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ ভাস্করগণের বহু পরিশ্রমের ফল বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

[৩]

শিল্পিগণের কার্য্য শেষ হইল। কতদিনে শেষ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। তোমাদিগের গণনা অনুসারে সে বোধ হয় দীর্ঘকাল। দিন আসিত, দিন যাইত; প্রতিদিন শ্রমজীবিগণ নগর হইতে আসিত, সন্ধ্যাসমাগমে আবার চলিয়া যাইত; তখন রক্ষিগণ আমাদিগের রক্ষণের ভার লইত। এইরূপ ভাবে যে কতদিন গেল তাহা যদি বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে একটি রাজ্যের ইতিহাসের একপৃষ্ঠা বলিয়া যাইতে পারিতাম। শিল্পিগণের কার্য্য শেষ হইল। ক্রমে শ্রমজীবিগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। খোদিত পাষাণ পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া যথাস্থানে নীত হইল। তোমরা বলিয়া থাক যে, গুরুভার পাষাণ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবগণ কর্ত্তৃক কিরূপে ইতস্ততঃ চালিত হইত, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পর্ণশালা সমূহ হইতে স্তূপ নির্ম্মাণের জন্য নির্ব্বাচিত ক্ষেত্র পর্য্যন্ত পঞ্চহস্ত বিস্তৃত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। সে পথের ইষ্টক এখনও সে প্রান্তরে পড়িয়া আছে। যেরূপ শকটে আমরা পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে নগরে আসিয়াছিলাম, তক্ষণকার্য্য শেষ হইলে সেইরূপ শকটে আরোহণ করিয়াই আমরা স্তূপক্ষেত্রে নীত হইয়াছিলাম। শতশত শ্রমজীবীর সমবেত চেষ্টায় আমরা যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়াছিলাম। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সে কথা সকলের প্রিয় হইবে না। নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে, প্রতিখণ্ড প্রস্তর যথাস্থানে ন্যস্ত হইলে, আমরা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাই বলিয়া যাই। স্থপতিগণ যখন সৌধ নির্ম্মাণ করে, তখন তাহাদিগের কার্য্যে নয়নপ্রীতিকর কিছুই থাকে না, কিন্তু সমগ্র সৌধ নির্ম্মিত হইলে, তাহা সত্য সত্যই আনন্দবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রমধ্যে অর্দ্ধগোলকাকার স্তূপ নির্ম্মিত হইল; সমান্তরালে, সমভাবে, সমান আকারের প্রস্তরখণ্ড যোজনা করিয়া শতহস্ত উচ্চ স্তূপ নির্ম্মিত হইল। শেষে তাহার কয়েকখণ্ড প্রস্তরমাত্র পড়িয়া ছিল; আর অশ্মরাশি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া আপনাদের প্রয়োজনে লইয়া গিয়াছিল; এতদিনে হয় ত সে কয়খানিও অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সেই রক্তবর্ণ, মসৃণ প্রস্তরে নির্ম্মিত অর্দ্ধগোলকাকার বিশাল স্তূপের পরিবর্ত্তে কি দেখিয়া আসিয়াছ? শ্রমজীবিগণের পদধূলি সঞ্চিত করিলে সেরূপ মৃৎপিণ্ড নির্ম্মিত হইতে পারিত। স্তূপের ক্ষেত্র বৃত্তাকার, সুতরাং তাহার বেষ্টনীও বৃত্তাকার। স্তূপের পার্শ্বে পঞ্চহস্ত বিস্তৃত পরিক্রমণের পথ; এই পথও পূর্ণ বৃত্তাকার ছিল। তির্য্যগ্‌ভাবে যোজিত প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশ করিয়া এইপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরিক্রমণের পথ বলিলে সহজবোধগম্য হইবে না, কালে তীর্থযাত্রীর ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহারা এখনও পরিক্রমণ করিয়া থাকে, পূজ্যব্যক্তির বা বস্তুর অর্চ্চনার পূর্ব্বে বা পরে প্রদক্ষিণ করিবার প্রথা এখনও তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান আছে—ইহাই পরিক্রমণ। পুণ্যার্থী পূর্ব্ব তোরণ দিয়া স্তূপবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত; পরে পরিক্রমণের পথ তিনবার বা সাতবার অতিক্রম করিয়া পুনরায় স্তূপ অর্চ্চনা করিত। স্তূপ নির্ম্মাণের কাল হইতে মুসলমান-সমাগমকাল পর্য্যন্ত অর্চ্চনার এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। তাহার পর আর কেহ স্তূপের অর্চ্চনা করে নাই। সে অনেক পরের কথা। স্তূপবেষ্টনীর পরে ত্রিহস্তপরিমিত স্থান ছিল, ইহার পরে বৃত্তাকার প্রথম স্তম্ভশ্রেণী। সমান্তরালে স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে চারিদিকে চারিটি তোরণ ছিল ও প্রতি তোরণের সম্মুখে এক একটি আবরণ স্থাপিত

হইয়াছিল। এই আবরণও স্তম্ভ, সূচি ও আলম্বনসজ্জায় নির্ম্মিত। স্তূপের পূর্ব্বদিকে যে তোরণ ছিল, তাহাই প্রধান তোরণ বলিয়া গণিত হইত; কারণ, স্তূপের পূর্ব্বদিকেই নগর অবস্থিত ছিল। দুইটি স্তম্ভের উপর তোরণ স্থাপিত; প্রতি স্তম্ভ একখণ্ড প্রস্তর হইতে খোদিত অষ্ট-কোণ স্তম্ভচতুষ্টয়ের সমষ্টি। স্তম্ভশীর্ষে চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডের উপর পত্রপুষ্প-পল্লব মধ্যে দুইটি উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি। সিংহপৃষ্ঠের উপর ন্যস্ত পুষ্প-মালাশোভিত চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডের উপর তোরণগুলি স্থাপিত। সমান্তরালে তিনটি তোরণ এইরূপ চতুষ্কোণ ব্যবধানের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। সিংহচতুষ্টয়ের পৃষ্ঠস্থ চতুষ্কোণ শিলাখণ্ডের উপর প্রথম তোরণ। উহার উভয় পার্শ্ব গোলাকার; এই অংশে কুণ্ডলীকৃতপুচ্ছ এক একটি মকর মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। মকরের সম্মুখে, দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মন্দির ও বামপার্শ্বে একটি স্তূপ। মন্দিরটি স্তম্ভশ্রেণীবেষ্টিত, চূড়ায় কেতন উড্ডীয়মান, মন্দির মধ্যে পুষ্পাবৃত্ত বেদী ও মন্দিরদ্বার পুষ্পমাল্য-পরিশোভিত। স্তূপটি দুই শ্রেণীর স্তম্ভবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত ও স্তম্ভ-শ্রেণীদ্বয়ের ব্যবধানে পরিক্রমণের পথ। অন্তরের স্তম্ভবেষ্টনের মধ্যে স্তূপের উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ কেতন উড্ডীয়মান। অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তূপ পুষ্পমাল্যবিজড়িত। স্তূপের উভয় পার্শ্বে মকরের নাসিকাগ্রভাগে স্তম্ভবেষ্টনীর সম্মুখে প্রস্ফুটিত কমলসমূহ খোদিত। মন্দির ও স্তূপের মধ্যভাগের স্থান হস্তিযূথ দ্বারা পরিপূর্ণ, তোরণের মধ্যভাগে একটি বোধিদ্রুম ও উহার উভয় পার্শ্বে হস্তিদ্বয় অঙ্কিত। হস্তিগণ শুণ্ডে সনাল উৎপল লইয়া বোধিবৃক্ষ অর্চ্চনায় যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তোরণের ব্যবধানে একাদশটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ; ইহার একটি অষ্টকোণ ও পরবর্ত্তীটি চতুষ্কোণ,—চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলির সম্মুখে যক্ষিণী ও অপ্সরোগণের মূর্ত্তি।

প্রথম তোরণের উপর দুইখণ্ড চতুষ্কোণ প্রস্তর স্থাপন করিয়া তাহার উপরেই দ্বিতীয় তোরণ স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তোরণের শেষাংশে পূর্ব্বের ন্যায় মকর, স্তূপ ও মন্দির খোদিত। এই তোরণের মধ্যভাগে বেদির উপর স্থাপিত কয়েকটি পল্লব ও উহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া সিংহ। সিংহগণের ব্যবধানে প্রস্ফুটিত ও প্রস্ফুটনোন্মুখ পদ্মসমূহ অঙ্কিত। ইহার উপরে তৃতীয় তোরণ। ইহাও চতুষ্কোণ প্রস্তরদ্বয়ের উপর স্থাপিত এবং ইহার ও দ্বিতীয় তোরণের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে—যখন এই স্তম্ভগুলি খোদিত হয় তখন ভাস্করগণ শ্রেণীবিন্যাসে স্থান নির্দ্দেশের জন্য প্রতিস্তম্ভে বর্ণমালার এক একটি অক্ষর খোদিত করিয়াছিলেন। নাগরিকগণ যখন অসমাপ্ত ভাস্করকার্য্য দেখিতে আসিতেন, তখন তাঁহারা এই স্তম্ভগুলিতে নূতন প্রকারের অক্ষর দেখিয়া ভাস্করগণকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তদুত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, বহুকাল ভারতবর্ষে বাসহেতু তাঁহারা তদ্দেশপ্রচলিত বর্ণমালা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাবনিক বর্ণমালা লুপ্তপ্রায়। যে বর্ণমালা তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা গান্ধার ও কপিশা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত; উহা ভারতীয় বর্ণমালার অনুরূপ নহে। উহা দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে লিখিত হইয়া থাকে ও উহার লিখন-প্রণালী ভারতীয় বর্ণমালার লিখন-প্রণালী হইতে সরল। পারসিকগণ যখন ঐরাণদেশীয় রাজগণের নেতৃত্বে উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের রাজকার্য্যালয়ে ব্যবহার প্রযুক্ত এই বর্ণমালাও তত্তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গান্ধার, কপিশা প্রভৃতি প্রদেশেও ভারতীয় বর্ণমালার প্রচলন আছে, তবে তাহা পারসিক

বর্ণমালার ন্যায় বহুলভাবে প্রচলিত নহে। সর্ব্বোচ্চ তোরণের মধ্যভাগে প্রস্ফুটিত অর্দ্ধকমলের উপর নবপত্রিকা ও তদূর্দ্ধে ধর্ম্মচক্র প্রতিস্থাপিত, ইহার উভয় পার্শ্বে প্রস্ফুটিত শতদলের উপর ত্রিরত্ন! ত্রিরত্নের অন্তর্ভাগ মৎস্যপুচ্ছাকার ও তাহার পার্শ্বে সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে শ্বেতচ্ছত্র ও চামরদ্বয়। প্রতি তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভে রাজার বংশপরিচয় উৎকীর্ণ,"সুঙ্গরাজ্যে গার্গীপুত্র বিশ্বদেবের পৌত্র, গৌপ্তীপুত্র অগরাজুর পুত্র বাৎসীপুত্র ধনভূতি এই তোরণ ও শিলাকর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন।"

পূর্ব্ব তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভে যে লিপি দেখিতে পাইতেছ, তদনুরূপ লিপি অপর তোরণত্রয়েও ছিল। দক্ষিণ তোরণের স্তম্ভদ্বয় হূণগণ অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট করিয়াছে। সে কথাও বলিব, কিন্তু সে অনেক পরের কথা। অপর তোরণদ্বয়ের স্তম্ভগুলির ভগ্নাংশমাত্র তোমরা পাইয়াছ, কিন্তু তাহারাও এই পূর্ব্ব তোরণের ন্যায় উচ্চশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তাহারাও ভাবিয়াছিল যে, তাহাদিগের উচ্চশীর্ষ আর কখনও মেদিনী স্পর্শ করিবে না। কিন্তু মুসলমানের দণ্ডপ্রহারে, হূণের অগ্নিদাহে ও ব্রাহ্মণগণের পুনরভ্যুত্থানে তাহারাও পুনরায় ধরাশায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বতোরণের পার্শ্বে যে স্তম্ভটি আছে, তাহা চাপদেবা নাম্নী বিদিশাবাসী রেবতীমিত্র নামক জনৈক শ্রেষ্ঠিপত্নীর দান। রেবতীমিত্রের পত্নী প্রতি তোরণের সান্নিধ্যে একটি স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। এইরূপে জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভ ও সূচিগুলি নির্ম্মিত ও যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেকের নাম তদ্দত্ত দ্রব্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আলম্বন কে দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই, তবে নগরবাসিগণের কথোপকথন শ্রবণে জানিয়াছিলাম যে, আর্য্যাবর্ত্তবাসী জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি আলম্বন নির্ম্মাণের ও

যথাস্থানে স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন; কিন্তু সুঙ্গরাজগণের ভয়ে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। চাপদেবা-প্রদত্ত স্তম্ভের একপার্শ্বে হস্তিত্রয়ের পৃষ্ঠে স্থাপিত পাদপীঠের উপর গরুড়ধ্বজধারী একটি অশ্বারোহীর মূর্ত্তি; অপর পার্শ্বে গণযুগলবাহিত পাদপীঠের উপর তিনটি হস্তী; ইহার মধ্যে মধ্যমটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রত্যেক হস্তীর স্কন্ধে অঙ্কুশহস্তে হস্তিপক উপবিষ্ট। প্রত্যেক স্তম্ভের উপরিভাগে একটি অর্দ্ধবৃত্ত অঙ্কিত ও উহার মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের অর্দ্ধভাগ। সাধারণতঃ তোরণের পার্শ্বে বেষ্টনের প্রথম স্তম্ভ এইরূপে চিত্রিত হইত। অপর স্তম্ভগুলিতে প্রত্যেক পার্শ্বে, উর্দ্ধে একটি ও নিম্নে একটি অর্দ্ধবৃত্ত এবং মধ্যভাগে একটি পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত হইত; ইহার মধ্যে কোনটিতে চিত্র, কোনটিতে প্রস্ফুটিত বা প্রস্ফুটনোন্মুখ পদ্ম খোদিত হইয়াছিল। উর্দ্ধের অর্দ্ধবৃত্ত ও মধ্যস্থলের পূর্ণবৃত্তের অন্তঃস্থ স্থানে কোনটিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর নৃত্যশীলা অপ্সরা, কোনটিতে সনাল উৎপল, কোনটিতে সফল আম্রপল্লব, কোনটিতে বা পুষ্পমাল্য খোদিত হইয়াছিল। স্তম্ভযুগলের ব্যবধানে তিনটি করিয়া সূচি স্থাপিত হইয়াছিল; তিনটি সূচি প্রতি স্তম্ভযুগলকে পরস্পর সংলগ্ন করিত। স্তম্ভের পার্শ্ব সূচিবৎ বিদ্ধ করিয়া থাকিত বলিয়া বোধ হয় ভাস্করগণ পাষাণময় বেষ্টনের এই অংশের "সূচি" নামকরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সূচির পার্শ্বে এক একটি পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত থাকিত; সাধারণতঃ সূচিগাত্রে বৃত্তগুলিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত ছিল, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সূচিতে নানাবিধ চিত্রও ছিল।

তাহার পর আলম্বন। উত্তর ভারতবাসী কোন্ মহাপুরুষ যে এই আলম্বনের ব্যয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই; কিন্তু আলম্বনটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল। স্তূপবেষ্টনীর সমুদায় স্তম্ভের ও তোরণের

আবরণগুলির স্তম্ভসমূহের শীর্ষে আলম্বন স্থাপিত হইয়াছিল। আলম্বনের শীর্ষদেশ ঈষৎ গোল ও মসৃণ; প্রতি পার্শ্বে সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের অভ্যন্তরে, উপরে একশ্রেণী চতুর্ভুজ ও নিম্নে একশ্রেণী পুষ্পমাল্যে লম্বিত ঘণ্টা; এতদ্দ্বয়ের অভ্যন্তরে কোন স্থানে হস্তী, কোন স্থানে বা মকরমুখ হইতে নির্গত মৃণাল বক্রগতিতে চলিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট স্থান পত্র-পুষ্প-ফল-সিংহ-হস্তি-বানর প্রভৃতি জীব ও নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত। আলম্বনের কোন স্থানে প্রদাতার নাম নাই বটে, কিন্তু প্রতি চিত্রের নিম্নে বা উপরে উঁহার নাম অঙ্কিত আছে ও আলম্বন যে স্থানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে একটি উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

স্তূপ বা স্তূপবেষ্টনীর নির্ম্মাণকার্য্য যতদিন চলিতেছিল, ততদিন যবন ভাস্করগণ, রাজপুরুষ, শ্রমজীবী বা নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেন নাই। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে যবনজাতীয় দেশীয় ভাস্করগণ রাজসমীপে যাইয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে নগর হইতে দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ আসিয়া প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কিন্তু রক্ষিগণ রাজাদেশে কাহাকেও বেষ্টনীর মধ্যে আসিতে দিল না। তখনও মঞ্চসমূহ অপসারিত হয় নাই; গুরুভার তোরণগুলি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্য যে মৃৎস্তূপগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি তখনও দূরে নিক্ষিপ্ত করা হয় নাই; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সর্ব্ববিধ আকারের ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি পরিক্রমণের পথ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু প্রবল বাসনার বলে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় সেই বিশাল জনসঙ্ঘ বার বার আসিয়া মুষ্টিমেয় রক্ষিগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। হস্তিপৃষ্ঠে, রথে, উষ্ট্রে, ও অশ্বে নাগরিকগণ আসিয়া বেষ্টনীর

মধ্যভাগে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; জনতা বর্দ্ধিত হওয়ায় কোষ্ঠপালকে সংবাদ দিয়া রক্ষিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইল। তখন হতাশ হইয়া সেই জনসংঙ্ঘ বেষ্টনীর বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিল। উৎসাহে ও দুর্দ্দমনীয় বাসনায় মত্ত হইয়া তাহারা তাহাদিগের বর্ষীয়ান্ ধর্ম্মযাজকের আগমন লক্ষ্য করে নাই। আজ তিনিও যেন নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া নগর হইতে স্তূপবেষ্টন পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ এই বিশাল জনতা ভেদ করিয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার জন্য জনসমুদ্রের মধ্য দিয়া পথ উন্মুক্ত হয় নাই। তাঁহার ঈষন্নমিত দেহ দেখিয়া যদি একজন সসম্ভ্রমে অপসৃত হইয়াছে, তখনই দশজন দশদিক্ হইতে সেই স্থান অধিকারের চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহার ক্ষীণ দেহ জনসঙ্ঘের পেষণে বহুবার পীড়িত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া যদি কেহ সলজ্জভাবে সরিয়া যাইবার উদ্যম করিয়াছে, তখনই সে বুঝিয়াছে, সে আশা বৃথা ; কারণ, তাহার পরক্ষণেই অপরে সে স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হস্তী ও উষ্ট্রের আস্ফালন ও রথচক্রের ঘূর্ণন উপেক্ষা করিয়া ধূলিধূসরিত দেহে তিনি রক্ষিগণের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; আসিয়া দেখিলেন, রাজা তখনও আইসেন নাই, যবনচতুষ্টয় তাঁহার জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনিও বেষ্টনীর বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহারই অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চতুরশ্বযোজিত রথ স্তূপবেষ্টনী পর্য্যন্ত আসিতে পথ পায় নাই ; নগরদ্বার হইতে বাহির হইয়াই তাঁহাকে রথ হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছে। জনতার মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে সবিনয়ে বেষ্টনীর দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে ; অনুরোধ উপরোধ অতিক্রম করিয়া, ক্ষিপ্তপ্রায় জনতাকে শান্ত করিয়া নগ্নপদে রাজা বেষ্টনীর প্রবেশপথে উপস্থিত হইলেন। তখন

যবন শিল্পিগণ, বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও রাজা বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বেষ্টনীর অন্তরালে কি হইল, তাহা বলিবার বোধ হয় আবশ্যকতা নাই। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে রাজা দেখিলেন, চারিদিকে চারিটি তোরণ প্রায় আকাশ স্পর্শ করিয়াছে; প্রতি তোরণগাত্রে তাঁহার নাম ও বংশপরিচয় খোদিত আছে; প্রতি স্তম্ভে নাগ, যক্ষ ও কিন্নর প্রভৃতি উপদেবতাগণের মূর্ত্তি; সূচিতে জাতক বা অপর কোন চিত্র। তাঁহার সে সময়ে বিশেষ বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই; তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে শিল্পকীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। শিল্পিগণ ও ধর্ম্মযাজক নীরবে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক প্রহর কাল রাজা স্তম্ভের পর স্তম্ভ, সূচির পর সূচি, সমুদায় স্তূপ ও বেষ্টনী পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া রাজা ধনভূতি ও ধর্ম্মযাজক বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। ইতিমধ্যে জনসঙ্ঘে কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সম্মুখ পংক্তির নাগরিকগণ ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিল। রাজাদেশে রক্ষিগণ জনতা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজসমীপে আনয়ন করিল। তখন তাঁহারা সকলে সেই সূচিবৎ তীক্ষ্ণ শিক্ষাসঙ্কুল অনাবৃত ভূমিতে উপবেশন করিয়া ভবিষ্যতের কার্য্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ নাগরিকগণকে রাজসমীপে আসিতে দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইল; তাহারা বোধ হয় ভাবিল যে, রাজা হয়ত তাহাদিগের আশা পূর্ণ করিবার জন্য প্রধান প্রধান নাগরিকগণকে সমীপে আহ্বান করিয়াছেন। কতদিন হইতে তাহারা শুনিয়া আসিতেছে যে, উপাসক ও উপাসিকাগণের পূজার জন্য তথাগতের দেহাবশেষ আনীত হইবে! মথুরাবাসীরা সদ্ধর্ম্মীদিগের জন্য ভস্মাবশেষের এক কণা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাহারা শুনিয়া আসিতেছে যে, নগরপ্রান্তে গর্ভচৈত্য নির্ম্মিত হইবে; চৈত্যগর্ভে

তথাগতের দেহাবশেষ রক্ষিত হইবে; সুদূর পর্ব্বত হইতে নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য রক্তবর্ণ প্রস্তর আনীত হইবে; সুদূর উদ্যান, গান্ধার ও কপিশা হইতে যবন শিল্পী আসিয়া নূতন ও পুরাতন ভাস্কর্য্যমিশ্রিত নব প্রথায় স্তূপবেষ্টনী নির্ম্মাণ করিবে। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় পর্ব্বতসানু হইতে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অশ্মরাশি সঞ্চিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে যবন শিল্পী এবং মগধ ও মথুরা হইতে দেশীয় ভাস্করগণ আনীত হইয়াছে; স্তূপও নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অর্থ প্রদান করিয়াছে বা বিনা পারিশ্রমিকে পরিশ্রম করিয়াছে, অথচ তাহারা স্তূপ দেখিতে পাইবেনা বা বেষ্টনীর অভ্যন্তরে যাইতে পারিবে না, ইহা তাহাদিগের নিকট অবিচার বলিয়া বোধ হইল। পরামর্শান্তে রাজসমীপে আহূত নাগরিকগণ জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সপ্তাহান্তে স্তূপগর্ভে তথাগতের শরীর নিহিত হইবে; সেই দিন নগরে অষ্টপ্রহরব্যাপী উৎসব হইবে ও সেইদিন প্রাতঃকাল হইতে সকলেই বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশের ও অর্চ্চনার অধিকার লাভ করিবে। তাঁহারা জানাইলেন যে, রাজা তখনও ব্রাহ্মণগণের উপদ্রবের আশঙ্কা করেন; কারণ ইতোমধ্যে তাহারা দুই একবার বিপৎপাতের চেষ্টা করিয়াছে; সুতরাং অসম্বদ্ধ জনপ্রবাহ বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ছাড়িয়া দিলে তাহারা অবসর পাইয়া নূতন কি উৎপাত করিবে তাহা বলা যায় না। বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সকলকে বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশলাভের অনুমতি দিবার বিরোধী হইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, অপর সকলের ন্যায় তাঁহারাও স্তূপ দেখিবার আশায় নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহারাও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তখন সেই বিশাল জনসঙ্ঘ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শুনিলাম সপ্তাহান্তে উৎসব হইবে। তক্ষণের ক্লেশ ভুলিয়া যাইলাম, উৎসব কিরূপ তাহা জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। মনুষ্যজাতিকে অল্পদিন দেখিতেছি, যতই দেখিতেছি বিস্ময় ততই বৰ্দ্ধিত হইতেছে। সেই কৃষ্ণবর্ণ জাতি কোথায় গেল, সেই উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ জাতি কোথায় গেল,—শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রিত অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার জাতি কোথা হইতে আসিল? এ সকল কথার মীমাংসা বোধ হয় আজও হয় নাই, কখনও হইবে কি না সন্দেহ। তবে যদি আমার ন্যায় অতীতের সাক্ষী আরও কেহ আইসে, আমা অপেক্ষা প্রাচীন কথার অবতারণা যদি কেহ করে, অথবা মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইতে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপার সমূহে লিপ্ত অপর কেহ যদি নিজের বাক্‌শক্তি পরিস্ফুটিত করিবার চেষ্টায় সফলকাম হয়, তবেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। কখনও মনুষ্যজাতির উৎসব দেখি নাই। নূতন দৃশ্য দেখিবার উৎসাহ ও দৃষ্টসমৃদ্ধির স্মৃতি এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, সে উৎসবের চিত্র অদ্যাপি আমার পরিস্ফুট আছে। নূতন বেশে, নূতন চিত্রে শোভিত হইয়া তক্ষকের শাণিত অস্ত্রাঘাতের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

---

[৪]

উৎসবের পূর্ব্বদিন হইতে নবনির্ম্মিত স্তূপ পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইতে লাগিল। তোরণ, স্তম্ভ, আলম্বন হরিদ্বর্ণ পত্রে ও নানা বর্ণের পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া গেল। তৎপূর্ব্বে সে ভাবে আমাদিগকে কেহ সজ্জিত করে নাই। পরে সদ্ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া যখন স্তূপের যশঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল তখনও এবম্বিধ উৎসব আমি কখনও দেখি নাই। সদ্ধর্ম্মানুরাগী শক-রাজাগণের আগমনে হেমরজতখচিত আবরণে স্তূপের চতুষ্পার্শস্থ বিশাল প্রান্তর পর্য্যন্ত আবৃত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু শ্যাম পল্লব ও শ্বেত পুষ্প মণ্ডিত হইয়া স্তূপের যে শোভা হইয়াছিল, তাহা আর কখনই দেখি নাই। স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ নগরাভিমুখে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার আবরণে চারিটি স্তম্ভ ছিল—প্রথম স্তম্ভে তিনটি দেবমূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল। প্রথম স্তম্ভের উত্তর দিকে নাগরাজ চক্রবাকের মূর্ত্তি। নাগরাজ পর্ব্বত-শিখরে দণ্ডায়মান, তাঁহার পদতলে কন্দরে কন্দরে সিংহ, বৃক প্রভৃতি শ্বাপদগণ রক্ষিত হইতেছে। নাগরাজের মস্তকে পঞ্চশীর্ষ সর্প তাঁহার নাগত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। কেয়ূর, বলয়, হার প্রভৃতি রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া নাগরাজ পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেছেন। নাগরাজের উপরে এবং স্তম্ভের শীর্ষদেশে যে অর্দ্ধবৃত্তের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা নানাবিধ পত্রের চিত্রে পূর্ণ ছিল। ধর্ম্মরক্ষিত নামক জনৈক প্রকৃত বিশ্বাসী এই স্তম্ভের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। প্রথম স্তম্ভের অপর দুই পার্শ্বে গঙ্গিত ও হয়গ্রীব নামক যক্ষদ্বয়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, কেবল চতুর্থ পার্শ্বে সূচিত্রয়ের ভেদের জন্য কোন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। গঙ্গিত করিপৃষ্ঠে ও অজকালক শিলাসঞ্চয়ের উপরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়-

মান। গঙ্গিতের মস্তকের উপরে অর্দ্ধবৃত্তে পতাকা শোভিত একটি স্তূপ ও অজকালকের মস্তকের উপরে অর্দ্ধবৃত্তে পত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। উৎসবের পূর্ব্বে সজ্জার দিন আলম্বন হইতে যক্ষত্রয়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত শ্বেত পুষ্পমালায় জড়িত হইয়াছিল, কেবল অর্দ্ধবৃত্তগুলি দৃশ্যমান ছিল। প্রত্যেক যক্ষের মস্তক ও বক্ষ বিবিধ বর্ণের পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়াছিল, নবজাত পল্লবে মূর্ত্তিত্রয়ের বাহুমূল হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এইরূপে আবরণ ও বেষ্টনের প্রত্যেক স্তম্ভ-অঙ্কিত স্থান ব্যতীত পত্রপুষ্পে মণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল, আলম্বনের শার্ষদেশ আম্রপল্লবে ও পার্শ্বদেশ রক্তবর্ণ পুষ্পে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। আলম্বন হইতে প্রথম স্থচি পর্য্যন্ত ফলের স্তবক লম্বিত হইয়াছিল। তোরণ স্তম্ভদ্বয়ের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। পাদদেশ হইতে প্রথম তোরণ পর্য্যন্ত স্তম্ভ-দ্বয় শ্বেত, রক্ত, নীল ও হরিদ্রাভ পুষ্পের মালায় জড়িত হইয়া গোলাকার ধারণ করিয়াছিল। স্তম্ভ শীর্ষের শীর্ষচতুষ্টয় নাগকেশর পুষ্পে ও তোরণ-ত্রয় নানাবিধ চম্পকমাল্যে ভূষিত হইয়াছিল। সর্ব্ব নিম্নের তোরণ-হইতে বহু আয়াসলব্ধ সহস্রদল শ্বেতপদ্মশ্রেণী লম্বিত হইয়াছিল। সর্ব্বো-পরি ছত্রবাহী অশ্বদ্বয় ও ধর্ম্মচক্র ত্রিরত্নের মর্য্যাদা জ্ঞাপনার্থ ত্রিবর্ণের পুষ্প মণ্ডিত হইয়াছিল।

তোমরা স্তম্ভগাত্রে যেরূপ স্তূপের চিত্র দেখিয়া থাক, নবনির্ম্মিত স্তূপও আকারে তদনুরূপ ছিল। অর্দ্ধগোলাকার স্তূপশীর্ষে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ স্থাপিত ছিল। স্তম্ভের উপরিভাগে মধ্যদেশে মাল্যশোভিত ছত্র ও চারিকোণে পতাকাবাহী দণ্ডচতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসব-সজ্জার দিনে পতাকার দণ্ড হইতে তোরণশীর্ষ পর্য্যন্ত ও চতুষ্কোণ স্তম্ভ হইতে বৃত্তাকার আলম্বন শ্রেণী পর্য্যন্ত সুবৃহৎ মাল্য লম্বিত হইয়াছিল। স্তূপের

উৰ্দ্ধদেশে মাল্য আবৃত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন, শ্বেতচন্দ্রাতপের পরিবর্ত্তে শ্বেতবর্ণ পুষ্পের আতপত্র আনিয়া স্তূপশীর্ষে স্থাপন করা হইয়াছে। পত্রপুষ্পমগুলের উপরে উপাসক-উপাসিকা ও দর্শকগণ আসিয়া যাহা দেখিল তাহা বলিতেছি। কোন স্থানে পুষ্পমালার মধ্য হইতে বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত চিত্র যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃত্তের মধ্যভাগে উচ্চ আসনের উপরে সপুষ্প পাটলীবৃক্ষ, শাখায় ও কাণ্ডে স্তবকে স্তবকে পাটলী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। চারিপার্শ্বে নতজানু হইয়া বা দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাসক ও উপাসিকাগণ পুষ্প ও মাল্যদ্বারা বৃক্ষের অর্চ্চনা করিতেছে, কারণ ইহা বুদ্ধ ও বিপশ্বীর বোধিদ্রুম। অন্য স্থানে স্রজশোভিত চতুষ্কোণ উচ্চাসনের উপরে দীর্ঘকায় শালবৃক্ষ, পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ অর্চ্চনায় ব্যাপৃত, কারণ ইহা বুদ্ধ বিশ্বভূর বোধিদ্রুম। অপর স্থানে স্তম্ভ চতুষ্টয়ের উপরে স্থাপিত চতুষ্কোণ আসনে সফল উড়ুম্বর বৃক্ষ, ইহার শাখা সমূহ হইতে মাল্যসমূহ লম্বমান; উভয় পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ, কারণ ইহা বুদ্ধ কনকমুনির বোধিদ্রুম। তোমরা যে স্তম্ভটিকে অসম্পূর্ণ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহার মধ্যভাগে বৃত্তের মধ্যে গোলাকার আসনে স্থাপিত শিরীষবৃক্ষ আছে, উৎসবের দিন উহা অপরাজিতার মালায় বেষ্টিত ছিল। ইহার উভয় পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ বিদ্যমান, কারণ ইহা ক্রকুচ্ছন্দের বোধিদ্রুম। অপর স্থানে দ্বাদশ স্তম্ভের উপর স্থাপিত চতুষ্কোণ আসনে অশ্বত্থবৃক্ষ; ইহার চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভশ্রেণী বিন্যস্ত। বৃক্ষকাণ্ডের উভয়-পার্শ্বে স্তম্ভশীর্ষে ধর্ম্মচক্র ও তদুপরি ত্রিরত্ন। বৃক্ষের শাখায় শাখায়, অসংখ্য মাল্য লম্বিত। আকাশে গন্ধর্ব্বগণ বংশী-নিনাদ করিতেছে ও সুপর্ণাগণ ইতস্ততঃ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। বৃক্ষকাণ্ডের চারি পার্শ্বে উপাসক

ও উপাসিকাগণ এবং সঙ্ঘারামের গবাক্ষে অসংখ্য দর্শক চিত্রিত রহিয়াছে। স্তম্ভবেষ্টনের বহির্দ্দেশে একটি বৃহদাকার স্তম্ভ ও তচ্ছীর্ষে শুণ্ডে মাল্য লইয়া দণ্ডায়মান একটী হস্তীর মূর্ত্তি। ইহাই ভগবান শাক্যমুনির বোধিদ্রুম। স্তম্ভবেষ্টনের ও বহির্দ্দেশস্থ স্তম্ভ মহারাজ ধর্ম্মাশোক-বিনির্ম্মিত। অপর স্থানে স্তম্ভশ্রেণীর উপর বিন্যস্ত দ্বিতলগৃহ। স্তম্ভশ্রেণী-বিভাগের মধ্যে বেদি, উহার উপরিভাগে পুষ্পাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ও একপার্শ্বে ষোড়শটি মানবহস্তাঙ্ক। মহাবোধিদ্রুমের পার্শ্বে ভগবান শাক্যমুনি সম্বোধিলাভের পর যে স্থানে সপ্তদিবসকাল মনুষ্যের হিতচিন্তায় মগ্ন হইয়া পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, পরে ধর্ম্মাশোক সেই স্থানে এই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহাই ভগবানের সংক্রমণের স্থান। একটি সূচিগাত্রে এই চিত্রটি অঙ্কিত আছে। অপরস্থানে চারিটি স্তম্ভশীর্ষে সংন্যস্ত বিহারের মধ্যে, রত্নখচিত আসনে ভগবানের ধর্ম্মচক্র, চক্রের উপরে ছত্র ও মাল্য, পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ। বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে বিশাল তোরণদ্বার। ইহা এত উচ্চ যে হস্তিপক আরোহী লইয়া ইহার অভ্যন্তরে আরোহীকে প্রবেশ করাইতেছে। তোরণের পশ্চাতে দ্বিতীয় হস্তিপক হস্তীর আহারের জন্য একটি বৃক্ষকে পল্লবশূন্য করিতেছে; বামপার্শ্বে অশ্বচতুষ্টয়-বাহিত রথ দুইটি আরোহী লইয়া দ্রুতবেগে বিহারা-ভিমুখে আগমন করিতেছে; ইহার পশ্চাতে একটি বৃক্ষে একটি ছত্র রহিয়াছে,—কোন দরিদ্র উপাসক স্থানাভাবে চক্ররাজের উদ্দিষ্টছত্র বৃক্ষে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছে। অপর স্তম্ভে বৃত্তমধ্যে মায়াদেবীর গর্ভধারণের চিত্র। খট্টায় মায়াদেবী সুষুপ্তা, খট্টানিম্নে ভৃঙ্গার ও পাদদেশে প্রদীপ, নিম্নে আসনদ্বয়ে উপবিষ্ট পরিচারিকাদ্বয় ব্যজনে ও সেবায় নিযুক্তা, একজন সখী করযোড়ে মায়াদেবীর মস্তকের নিকট উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

ঊর্দ্ধে শ্বেতহস্তী। ভগবান শ্বেত হস্তীর আকার ধারণ করিয়া মায়াদেবীর গর্ভে আশ্রয় লইতেছেন। অপর স্তম্ভে বৃত্তমধ্যে পর্ব্বতশ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে, পর্ব্বতের মধ্যদেশে বিশাল গুহা ও তন্মধ্যে রত্নখচিত আসন। আসনের ঊর্দ্ধে ছত্র। চতুষ্পার্শ্বে উপাসকগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুহার বহির্দ্দেশে সিংহ, শৃগাল, ময়ূর, বানর প্রভৃতি নানা জীব অঙ্কিত রহিয়াছে। গুহা-দ্বারের সান্নিধ্যে সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তে লইয়া গন্ধর্ব্ব পঞ্চশিখ দণ্ডায়মান। ইহা ইন্দ্র-শিলাগুহা। একদা বর্ষাকলে ভগবান শাক্যমুনি যখন রাজগৃহ শৈলমালার সঙ্গিহীন শৈলশিখরে পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেছিলেন, তখন জ্ঞান-লিপ্সাপ্রণোদিত হইয়া বাসব গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও বুদ্ধদেবকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রকৃত বিশ্বাসীরা কহিয়া থাকেন যে, অশ্মখণ্ডের উপরে ভগবানের অঙ্গুলি-চালনার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; বৌদ্ধজগতে ইহার নাম ইন্দ্রশিলাগুহা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছিলেন ততক্ষণ পঞ্চশিখ বীণাসংযোগে সঙ্গীতধ্বনি করিতেছিলেন। অপর স্তম্ভে মৃগজাতকীয় চিত্র। বৃত্তমধ্যে তিনটি বৃক্ষ; দক্ষিণপার্শ্বে পলায়নপর মৃগযুথ, মধ্যদেশে গর্ত্তমধ্যে পতিত একটি বৃহৎ মৃগ ও গর্ত্তের পার্শ্বে স্তুতিশীল মনুষ্যত্রয়, বামপার্শ্বে জনৈক মনুষ্য মৃগযুথের প্রতি শরত্যাগ করিতেছে। কথিত আছে, কোন এক পূর্ব্বজন্মে ভগবান শাক্যমুনি মৃগযূথপতি ছিলেন। একদা জনৈক ব্যাধ মৃগকুল তাড়না করিলে একটি গর্ভবতী মৃগী পলায়নে অক্ষম হইয়া যূথপতিকে সম্বোধন করিয়া কহে, "আমি পলায়নে অক্ষম ও আমি নিহত হইলে আমার গর্ভস্থ ভ্রূণ পর্য্যন্ত নিহত হইবে।" ইতিমধ্যে ধাবমান যূথের সম্মুখে একটি গর্ত্ত দেখিয়া হরিণী পলায়নে বিরত হইল।

যূথপতি গর্ত্তের মধ্যে লম্ফপ্রদান করিয়া হরিণীকে কহিলেন "তুমি আমার পৃষ্ঠে পাদনিবেশ করিয়া গর্ত্ত পার হইয়া যাও।" তখন অপর সকলে লম্ফপ্রদানে গর্ত্ত পার হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া যূথপতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর স্তম্ভে নাগজাতক। একটি সরোবরতীরে তিনটি হস্তী দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে একটি কুলীরক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। কথিত আছে, বনমধ্যে এক বিশাল সরোবরে একটি অতি বৃহৎ কুলীরক বাস করিত। হস্তিগণ জলপানের জন্য সরোবরে আসিলে দশরথরাজ কোন একটির পদ দৃঢ়রূপে আমরণকাল ধারণ করিয়া থাকিতেন। হস্তীর মৃত্যু হইলে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তিনি আহার পাইতেন। পরে বোধিসত্ত্ব হস্তিনীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কুলীরকের ব্যবহার শুনিলেন। একদা তিনি পিতার অনুমতি লইয়া সরোবরে গমন করিলেন। কুলীরক তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও পরে তাঁহার পত্নীর অনুরোধে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার পাদপেষণে কুলীরক বিনষ্ট হইল। অপর স্থানে ছদন্তজাতক অঙ্কিত আছে। কথিত আছে, হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী ছদন্ত হ্রদের সান্নিধ্যে অষ্টসহস্র ষড়দন্ত হস্তী বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এক সময়ে এই হস্তিযূথের অধিপতি ছিলেন ও তাঁহার মহাসুভদ্রা ও বুল্লসুভদ্রা নাম্নী দুইটী পত্নী ছিল। একদা যূথপতি একটি বৃক্ষ উৎপাটন করায় মহাসুভদ্রার নিকটে পত্রপুষ্প ও বুল্লসুভদ্রার নিকটে শুষ্ক পত্র ও শাখা মাত্র পতিত হইল। এই সময় হইতে বুল্লসুভদ্রা যূথপতির প্রতি বিরক্ত হইল ও বিগত পঞ্চশত বুদ্ধদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে,

সে যেন পরজন্মে রাজকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও ব্যাধ প্রেরণ করিয়া যূথপতিকে বিনষ্ট করিতে পারে। বুদ্ধগণ তাহার আশা সফল করিলেন। বুল্লসুভদ্রা অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিতা হইল ও কোন এক রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীরাজের সহিত বিবাহিতা হইল! সে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পূর্ব্বস্বামীর নিধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। তৎপ্রেরিত ব্যাধ তাহার নির্দ্দেশানুসারে ছদন্তহ্রদতীরে আসিয়া হস্তিযূথের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। ব্যাধ দেখিল, হস্তিযুথপতি হ্রদের একই স্থানে প্রতিদিন স্নান করিয়া থাকেন। সে সেই স্থানে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া উপরে শর-নিক্ষেপের স্থান মাত্র রাখিয়া কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার দ্বারা উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত রহিল। পরদিবস যুথপতি স্নানার্থ আসিয়া শরাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে অপর হস্তিগণ আসিয়া ব্যাধের অনুসন্ধান করিতে করিতে ভূগর্ভে কাষায়-পরিহিত ব্যাধকে দেখিতে পাইল। ব্যাধের মুখে সকল কথা অবগত হইয়া যূথপতি তাহাকে হত্যা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "বুল্লসুভদ্রা সামান্য কারণে আমার প্রাণ হরণে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া আমার দন্তগুলির জন্য তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু আমার দন্ত লইয়া তাহার কোন উপকার হইবে না। তবে তুমি স্বচ্ছন্দে আমার দন্ত কর্ত্তন করিতে পার।" ব্যাধ দন্তগুলি স্পর্শ করিতে অক্ষম হওয়ায় যূথপতি তাহাকে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া ধারণ করিলে সে দন্ত ছেদন করিল; ইহার পর যূথথতির মৃত্যু হইল। চিত্রে বৃত্তমধ্যে বৃক্ষতলে চারিটি হস্তী দণ্ডায়মান। ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দন্ত কর্ত্তন করিতেছে। কোন

স্থানে স্তম্ভের মধ্যভাগে চতুষ্কোণ বেষ্টনের মধ্যে স্বর্গের বৈজয়ন্ত-প্রাসাদ অঙ্কিত আছে। প্রাসাদ ত্রিতল, দ্বিতলে ও ত্রিতলে বাতায়নপথে অঙ্গনাগণের মুখ লক্ষিত হইতেছে, নিম্নতলে একটি গৃহে কতকগুলি দেবদেবী রহিয়াছেন। পার্শ্বে বিহারমধ্যে ভগবান শাক্যমুনির উষ্ণীষ রক্ষিত। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একজন পুরুষ চামর ব্যজন করিতেছে ও বাম পার্শ্বে একজন উপাসক করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিহার ও প্রাসাদের সম্মুখে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে ও ভূমিতে উপবিষ্ট পুরুষগণ বীণা প্রভৃতি যন্ত্র বাদন করিতেছে। শাক্যমুনির মহাপরিনির্ব্বাণের পর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার উষ্ণীষ লইয়া স্বর্গে গমন করেন ও তথায় সদাসর্ব্বদা দেবগণ তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্যগীত করিয়া থাকে। ভিক্ষু ঋষিপালিত এই স্তূপনির্ম্মাণকালে এই স্তম্ভটি দান করিয়াছিলেন। ইহার দুইপার্শ্বে চতুষ্কোণ বেষ্টনীর মধ্যে ছয়টি চিত্র আছে ও ইহাতে বৃত্ত বা অর্দ্ধবৃত্ত নাই। অপর পার্শ্বদ্বয়ে সূচী স্থাপনের জন্য ছয়টি ছিদ্র আছে। ইহার একপার্শ্বে উপরিভাগে বৈজয়ন্ত-প্রাসাদ ও উষ্ণীষ-বিহারের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই পার্শ্বে সর্ব্বনিম্নের চিত্রে মগধরাজ অজাতশত্রুর বুদ্ধ-বন্দনার চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্রটি দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। নিম্নে চারিটি হস্তী ও তৎপৃষ্ঠে দুইটি পুরুষ ও তিনটি স্ত্রীলোক। ইহার পরে বৃক্ষদ্বয়ব্যবধানে একটি চতুষ্কোণ বেদী ও তাহার সম্মুখে করযোড়ে নতজানু জনৈক পুরুষ। পশ্চাতে একজন পুরুষ ও চারিজন স্ত্রীলোক। কথিত আছে, রাজা অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া বহুকাল যাবত অনায়াসে নিদ্রালাভ করিতে পারে নাই। শেষে তিনি তাঁহার ভ্রাতা

ও চিকিৎসক জীবকের উপদেশানুসারে বুদ্ধ-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। রাজা পঞ্চশত স্ত্রী সমভিব্যাহারে হস্তিপৃষ্ঠে রাজগৃহ নগরদ্বার হইতে নির্গত হইতেছেন। চিত্রের নিম্নদেশে হস্তিপৃষ্ঠে পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন রাজা অজাতশত্রু ও অপর জন হস্তিপক। চিত্রের ঊর্দ্ধদেশে নতজানু পুরুষ রাজা অজাতশত্রু। অপরস্থানে বৃত্তের মধ্যে অনাথ-পিণ্ডদের জেতবনদানের চিত্র। বৃত্তের মধ্যে বামপার্শে তিনটি বৃক্ষ। তিনটি মনুষ্য ভূমিতে চতুষ্কোণ সুবর্ণমুদ্রা বিস্তৃত করিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি শকট হইতে সুবর্ণ মুদ্রা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের পার্শ্বে শকটের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বৃত্তের দক্ষিণপার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র গৃহ আছে। তাহাদিগের ব্যবধানে পূর্ণভৃঙ্গার হস্তে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন, ইনি শ্রাবস্তী নগরের প্রধান শ্রেষ্ঠী অনাথ-পিণ্ডদ। অনাথপিণ্ডদের সম্মুখে কতকগুলি পুরুষ দণ্ডায়মান। কথিত আছে, ভগবান শাক্যমুনির জীবনকালে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধদেবের জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রাবস্তীনগরোপকণ্ঠে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতেছিলেন। নগরোপকণ্ঠে কুমারপাদ জেতের উদ্যান-বাটিকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি জেতের নিকট উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। জেত বলিয়াছিলেন যে সুবর্ণমুদ্রা কর্ত্তৃক ভূখণ্ড আচ্ছাদন করিয়া দিলে তিনি উদ্যান বিক্রয়ে প্রস্তুত আছেন। তদনুসারে অনাথপিণ্ডদ কোটি সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া অধিকাংশ-ভূমি আচ্ছাদন করিলে জেত অবশিষ্ট ভূমি বিনামূল্যে প্রদান করেন। অনাথপিণ্ডদ জলধারা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘের নামে উদ্যান উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিত্রে যে দুইটি গৃহ আছে তাহা গন্ধকূটি ও কোশম্বকূটি নামে আখ্যাত। যতদিন সদ্ধর্ম্মের মহিমা অম্লান থাকিবে ততদিন

জেতবনের নাম, অনাথপিণ্ডদের নাম ও কুটিদ্বয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। শুনিয়াছি, কালে শ্রাবস্তীনগরী মৃৎস্তূপে পরিণত হইয়াছে, জেতবনবিহার ও গন্ধকুটি ধূলিরাশিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু তীর্থযাত্রিগণের পথপ্রদর্শক ভিক্ষু ও শ্রমণগণ অদ্যাপি জেতবন ও কোশম্ব-কুটির নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কি দেখিয়া আসিয়াছ? রাপ্তী নদী তীরে কোশলরাজ প্রসেনজিতের উচ্চচূড় প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চূর্ণীকৃত হইয়া রাজপথের ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। শ্রাবস্তীনগরীর সেই মহাশ্মশান দেখিতে গিয়াছিলে কি? যাহারা পর্ব্বতবাসী পরাক্রান্ত শাক্য-জাতির ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরদিগকে দেখিয়াছ কি? শাক্যরাজদিগের গুরু ত্রৈপিটকোপাধ্যায় ভিক্ষুবল ও পুষ্যবুদ্ধি যে মহাবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শিলাসঙ্কুল উদ্ভিদ সমাবৃত তাহার ধ্বংসাবশেষও বোধ হয় দেখিয়াছ। গাহড়বালবংশীয় কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দ-চন্দ্র জেতবনে যে সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে সঙ্ঘারামের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শ্রাবস্তীমণ্ডলে, শ্রাবস্তীবিষয়ে, শ্রাবস্তীভুক্তিতে অষ্টসংখ্যক গ্রাম দান করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি তাহার ধ্বংসাবশেষ লইয়া নবরাজ্যের হৈমকান্তি রাজপুরুষগণ রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহাচীন হইতে কুরুবর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র মহাদেশের প্রকৃতবিশ্বাসিগণ যে নগরের পথের ধূলিমুষ্টি পবিত্রজ্ঞানে মহাযত্নে সুদূর পিতৃভূমিতে লইয়া যাইতেন, যে বিহার দর্শনে সহস্র সহস্র ক্রোশব্যাপী পথাতিক্রমজনিত শ্রম বিস্মৃত হইতেন, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া প্রকৃত বিশ্বাসিগণ যে স্থানে কোটি কোটি সুবর্ণমুদ্রা মন্দিরবিহারাদির শোভনার্থ ব্যয়িত করিয়াছিলেন, সে স্থানে শ্রাবস্তীনগরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিবার কিছুই নাই।

কোন স্তম্ভে মধ্যদেশে অর্দ্ধবৃত্ত নাই। পূর্ব্ববর্ণিত আবরণে প্রথম-স্তম্ভের ন্যায় নাগ বা যক্ষমূর্ত্তি, কোন স্তম্ভে বা অশ্বারূঢ় পতাকাবাহী পুরুষ বা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যাইত। এইরূপে চূলকোক দেবতা, সুদর্শনা যক্ষিণী, সিরিমা দেবতা, চন্দা যক্ষিণী, সূচীলোম যক্ষ, কুবের যক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কোন স্তম্ভে বৃত্ত বা অর্দ্ধ-বৃত্তের মধ্যে নানাবিধ কৌতুকাবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কোন স্থানে চারিটি বানর একটি হস্তীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। হস্তীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ড বন্ধন করিয়া দিয়াছে। একটী বানর বন্ধনরজ্জু ধরিয়া অঙ্কুশহস্তে হস্তীকে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে ও অপর তিনটি নৌকাগুণবাহীদিগের ন্যায় রজ্জু-দ্বারা বিশাল জীবটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বানরগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে, পূর্ব্ববর্ণিত পথপ্রদর্শক হস্তীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে, একটি বানর দন্তে দণ্ডায়মান হইয়া চালককে কি বলিতেছে। নিম্নে তিনটি বানর বংশী ঢক্কা ও ডমরু নিনাদিত করিতেছে, দৃশ্যান্তরে একটি রাক্ষস আসনে বসিয়া আছে—একটি বানর তাহার নাসিকারন্ধ্রে বক্র লৌহনিবেশপূর্ব্বক লৌহের শেষভাগ ধরিয়া আছে, নিম্নে একটী ক্ষুদ্র বানর ক্ষুদ্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া আছে। নাসারন্ধ্র সংন্যস্ত বক্রলৌহে রজ্জুখণ্ড আবদ্ধ করিয়া একটি হস্তীর গলদেশে বন্ধন করা হইয়াছে। হস্তী প্রাণপণ শক্তিতে টানিতেছে, হস্তিপক অঙ্কুশাঘাত করিতেছে, পশ্চাতে অপর বানর হস্তীর পদে দণ্ডাঘাত করিতেছে, ঊর্দ্ধে ও নিম্নে বানরদ্বয় শঙ্খ ও ঢক্কা নিনাদ করিয়া ভীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক হস্তীকে চালনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। চিত্র দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে

এত চেষ্টা সত্ত্বেও রাক্ষসের নাসারন্ধ্রের লোম উৎপাটিত হইতেছে না। কোন স্তম্ভে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় স্ত্রী বা পুরুষ, গরুড় বা কিন্নরধ্বজ হস্তে লইয়া ধীর পদক্ষেপে গমন করিতেছে। গরুড় বা কিন্নরধ্বজ বিস্ময়ের বিষয় নহে। এখন যেমন কিরাত দেশের প্রান্তে বৌদ্ধতীর্থে অসংখ্য বংশদণ্ডাগ্রে শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, রক্ত নানা বর্ণের কেতন দেখিতে পাও, তেমনই প্রাচীন যুগে মন্দির বা বিহার হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন নির্ব্বিশেষে নানাবিধ পতাকাশোভিত ধ্বজসমূহ পুণ্যার্থিগণকর্ত্তৃক স্থাপিত হইত। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মহারাজ ধর্ম্মাশোক স্থাপিত সিংহ, হস্তী ও বৃষধারী শিলাস্তম্ভ দেখিয়াছ, উহাও ধ্বজমাত্র। সামান্য তীর্থ-যাত্রীর বংশদণ্ডের পরিবর্ত্তে আসমুদ্রক্ষিতীশ সুচিক্কণ, সমুজ্জ্বল, মসৃণ শিলাস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া পুণ্যস্থানে কাষায় কেতন উড্ডীন করিয়া-ছিলেন। ধর্ম্মলিপি খোদিত হইবার পূর্ব্বে উপগুপ্তের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া অশোক আর্য্যাবর্ত্তে যে পুণ্যযাত্রা করিয়াছিলেন সেই সময়ে পুণ্যস্থান মাত্রেই ধর্ম্মাশোকের সিংহ, হস্তী বা বৃষধ্বজ স্থাপিত হইয়া-ছিল। কবে কোন যবন আসিয়া, ব্রাহ্মণগণের উপাস্য কোন দেবতার পদপ্রান্তে, আর্য্যাবর্ত্তের কোন প্রান্তে, গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; সহস্র সহস্র বর্ষ পরে তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের লেখ, সিন্দুর লেপন মুক্ত হইয়া পুনরায় নরলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে! তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া বিস্মিত হইও না। যদি ব্রাহ্মণের উপাস্য বাসুদেবের উদ্দেশে যবন তীর্থযাত্রী কর্ত্তৃক একটি পাষাণময় গরুড়ধ্বজ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্মের পঞ্চবিংশ শতাব্দীব্যাপী জীবনে যে লক্ষ লক্ষ কেতনবাহী ধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও দেখিতে পাইবে। পুণ্যস্থানে অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, রাজ

গৃহে, পাটলীপুত্রে, মহাবোধিতে, বৈশালীতে, বারাণসীতে, শ্রাবস্তীতে, কুশীনগরীতে, কোশাম্বীতে, সঙ্কাশ্যে, উজ্জয়িনীতে, মথুরায়, পৃথূদকে, স্থাণ্বীশ্বরে, জালন্ধরে, তক্ষশিলায়, নগরহারে, পুরুষপুরে, বাহ্লীকে, কপিশায় কত সহস্র ধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল। সদ্ধর্ম্মের গৌরবের তুলনায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরবও ক্ষীণ। সমস্বরে সদ্ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নামোচ্চারণ করা উচিত নহে।

প্রভাতে উৎসব। নববিবাহিতের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় দুর্দ্দমনীয় মনোবেগ লইয়া উষাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, যাহা দেখিলাম তাহা আর কখনও দেখি নাই, আর কখনও দেখিব না। তাহার প্রত্যেক ঘটনা আমার মনে কে যেন খোদিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই।

---

[৫]

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে নগরের দিক হইতে কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। তখন শিশির কাল। হিমকণসিক্ত প্রান্তরে শুভ্রতুষারের ক্ষীণাবরণ শুক্ল উত্তরচ্ছদের ন্যায় দেখাইতেছিল। হিমকণসিক্ত পল্লবে তুষারখণ্ড আবদ্ধ থাকায় মনে হইতেছিল যেন বনস্পতিগণ পুণ্যাহে লাজ নিক্ষেপ করিতেছেন। নৈশ তমোভেদ করিয়া যখন পূর্ব্বপ্রান্তে বাহ্লী-কাঙ্গনার সীমন্তে সিন্দুর ছটার ন্যায় অরুণরাগ লক্ষিত হইল, তখন জন-সঙ্ঘের পাদপেষণে প্রান্তরের তুষারাবরণ কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে, অসাধা-রণ কোলাহলে বিহগকুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, নানা রাগরঞ্জিত উষ্ণীষে ও শিরস্ত্রাণে সমগ্র প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জনতার মধ্যদেশে রজ্জুরক্ষিত কোষ্ঠপালগুপ্ত পথ, স্তূপবেষ্টনী হইতে নগরদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেন একটি বিশাল কালব্যাল মৃত্যু যন্ত্রণায় লম্বমান হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ পূর্ব্বে পুরাঙ্গনাগণ এই পথ পরিষ্কৃত করিয়া গেল, তাহাদিগের পর কুমারীগণ দলে দলে অঞ্চল ভরিয়া নানা-বিধ পুষ্প লইয়া আসিয়া সুগন্ধি কুসুমে পথ আচ্ছন্ন করিয়া গেল। সুগন্ধ জলপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে বালকগণ আসিয়া পুষ্পরাশি সিঞ্চন করিয়া গেল, ইতিমধ্যে স্তূপের চারি তোরণের আবরণপার্শ্বে উপবিষ্ট বাদকগণ যন্ত্র সংযোগে স্তুতিগান আরম্ভ করিল। আমরা যে পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া-ছিলাম তাহা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য পরিচারকগণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুপরি গন্ধবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নগরদ্বারে তূর্য্যনিনাদ শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নগরতোরণ হইতে দেবযাত্রা নির্গত হইল। দেবযাত্রার পুরোভাগে, পংক্তির পর পংক্তি চীবরধারী ভিক্ষু ও

শ্রমণ। প্রতি পংক্তিতে পাঁচজন, এইরূপ শতাধিক পংক্তি নির্গত হইল। পরে বাদিকা ও নর্ত্তকীদল পুণ্যসঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন করিতে করিতে ভিক্ষুগণের পদানুসরণ করিল। তাহাদিগের পরে বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া নগরের দেবদাসী, গণিকা, লেনাশোভিকাগণ আসিল। ইহারা নগরদ্বার হইতে নির্গত হইলে অত্যুচ্চ শ্বেতবর্ণ সপ্তচ্ছত্র পরিলক্ষিত হইল। শ্বেতচ্ছত্র দর্শনে জনতা হইতে বিশাল কলরব উত্থিত হইল, কোষ্ঠপালগণের রজ্জু বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া জনসঙ্ঘ নগরাভিমুখে প্রতিগমনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় যাত্রার পথ অবাধ রহিল, কিন্তু সে কলরব আর মধ্যাহ্নের আগে প্রশমিত হইল না। শ্বেতচ্ছত্র ক্রমে নিকটে আসিলে দৃষ্ট হইল যে, উহার নিম্নে সুবর্ণদণ্ডযুক্ত মুক্তা ও হীরকখচিত চন্দ্রাতপ। রাজা ধনভূতি ও তাঁহার মহিষীগণ নিজহস্তে চন্দ্রাতপের স্বর্ণদণ্ড ধারণ করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রাতপের নিম্নে স্বর্ণ নির্ম্মিত ছত্রদণ্ডধারী পাটলীপুত্রের সেই লোলচর্ম্ম মহাস্থবির। তাঁহার পার্শ্বে শ্বেতাঙ্গ দীর্ঘকায় শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি দক্ষিণহস্তে একটি স্ফটিকাধার লইয়া আসিতেছেন। মহাস্থবির সেই স্ফটিকাধারের উপর স্বর্ণছত্র ধারণ করিয়া আছেন। হিমক্লিষ্ট প্রভাতে নগ্নপদ ও স্বল্পাচ্ছাদন সত্ত্বেও বোধ হইতেছিল যেন, তাঁহার বয়সের অর্দ্ধ শতাব্দী কালের হ্রাস হইয়া গিয়াছে, লোলচর্ম্ম পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কালভারাবনত দেহযষ্ঠি দণ্ডের ন্যায় তুঙ্গ হইয়াছে, বোধ হয় নির্ব্বাণ লাভ হইলেও তাঁহার আকারের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইত না। তাঁহার পার্শ্বচর প্রৌঢ়কে দেখিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন, অন্যান্য সকলে বিস্ময়স্তিমিত নয়নে চাহিয়া রহিল। অদ্য দেবযাত্রায় তথাগতের শরীর-ভার বহনের সৌভাগ্য কাহার হইল তাহা

বুঝিতে পারা গেল না। চন্দ্রাতপের পশ্চাতে রাজকর্ম্মচারিগণ ও তাঁহাদিগের পশ্চাতে নগরের যে কেহ অবশিষ্ট ছিল সকলে বাহির হইয়া আসিল। দেবযাত্রা সম্পূর্ণরূপে তোরণদ্বার অতিক্রম করিল। আজি-কার দিনে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, রথ ব্যবহৃত হইল না—রাজা হইতে সামান্য নাগরিক পর্য্যন্ত সকলেই নগ্নপদে দেবযাত্রায় যোগদান করিলেন। ক্রমে যাত্রার পুরোভাগ স্তূপের তোরণের সম্মুখীন হইল। সদ্যঃস্নাত কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত যবনশিল্পিচতুষ্টয় জলধারা, অর্ঘ্য ও পুষ্পপ্রদানে দেবযাত্রার পূজা করিলেন; পরে যথাক্রমে সমগ্র দেবযাত্রা তিনবার স্তূপবেষ্টনী পরিক্রমণ করিল; পরে পূর্ব্ব তোরণ দিয়া বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিক্রমণের পথে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিল। দেবযাত্রার পুরোভাগ দক্ষিণ তোরণের সম্মুখীন, হইলে আর্ত্তিমিদোর পরিক্রমণের পথে আসিয়া বর্ত্তুলাকার স্তূপগাত্র স্পর্শ করিবামাত্র দুই খণ্ড বিশাল প্রস্তর অন্তর্হিত হইল; দৃষ্ট হইল, মানব দেহ পরিমিত স্থান মুক্ত হইয়াছে। যবনশিল্পীর আহ্বানে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত দশজন উল্কাধারী উন্মুক্ত পথে অগ্রসর হইল। ধনভূতি, পাটলীপুত্রবাসী মহাস্থবির ও তথাগতের শরীরভারবাহী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ব্যতীত অপর সকলেই বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। চামর হস্তে ধনভূতি, স্বর্ণছত্র হস্তে মহাস্থবির ও শরীরভারহস্তে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ উল্কাধারিগণের পশ্চাতে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছি গৃহমধ্যে বিস্তৃত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কক্ষের মধ্যভাগে বিশাল পাষাণনির্ম্মিত আধারে, সুবর্ণপাত্রে তথাগতের শরীরসহ স্ফটিকনিধান নিহিত হইয়াছিল। ক্রমে রাজা,—মহিষীগণ যথাযোগ্য অনুক্রমানুসারে রাজপুরুষ ও নগরবাসিগণ গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথাগতের শরীর দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনক্রিয়া সমাধা করিলেন।

শেষ নাগরিক যখন গর্ভগৃহ হইতে নির্গত হইল, তখন সূর্য্যোদয়ের পর দ্বিপ্রহর কাল অতীত হইয়াছে। ক্রমে প্রান্তর ও নগরোপকণ্ঠ, পটমণ্ডপে ও হরিদ্বর্ণ পল্লবাচ্ছাদিত কুটীরে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। নাগরিকগণের কথোপকথনে জানিতে পারিলাম যে, দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে জনসঙ্ঘের এক প্রাণীও নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। দেখিলাম প্রান্তরে নূতন নগর বসিয়াছে, রাজপুরুষগণ রাজপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন পথিপার্শ্বে—পটমণ্ডপে বা সামান্য বস্ত্রাচ্ছাদনে অসংখ্য বিপণি বসিয়াছে, ক্রেতারও অভাব নাই। নানাস্থান হইতে রন্ধনের ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। জনসঙ্ঘ দেব-দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া উৎসবানন্দে উন্মত্ত হইল। বেষ্টনের বহির্দ্দেশে পুষ্পবিক্রেতৃগণের বিপণি। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাহা-দিগের সঞ্চিত পুষ্পরাশি বিক্রীত হইয়া গেল, দিবাবসানের পূর্ব্বে আর তাহাদিগের পণ্যসংগ্রহ হইল না। স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ হইতে নগরদ্বার পর্য্যন্ত প্রধান রাজপথ। এই পথে পুষ্পবিক্রেতাদিগের, পরে সুরা ও তাম্বুল বিক্রেতাদিগের বিপণি। দেবার্চ্চন সমাপ্ত হইলে নগর-বাসিগণ যেন মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইয়া উঠিল; স্তূপবেষ্টনী হইতে বহির্গত হইয়াই দলে দলে আসব পানে ধাবমান হইল। পণ্যশালায় প্রবেশ করিয়া পূর্ণ পাত্র পান, বাহিরে আসিয়া তাম্বুল ক্রয় ও তাম্বুল-বিক্রেত্রীর সহিত হাস্য পরিহাস, কণ্ঠ শুষ্ক হইলে পুনরায় আসবের বিপণিতে প্রবেশ, এই কর্ম্মেই বোধ হয় অধিকাংশ নাগরিক দিনযাপন করিয়াছিল। নাগরিকগণ উৎসবের দিন যে পরিমাণে সুরা গলাধঃকরণ করিয়াছিল, তাহাতে সপ্তশতবর্ষ পরে হইলে তাহাদিগকে হূণজাতির সহিত তুলনা করিতাম। বৃক্ষতলে কোন স্থানে বারনারীগণ যন্ত্রসংযোগে নৃত্য-গীত আরম্ভ করিয়াছে; তাহাদিগের কম্পিত কলেবর ও রক্তনেত্র কাদম্বের

মহিমা ঘোষণা করিতেছে। উৎসবের জন্য শৌণ্ডিকগণ বোধ হয় কদম্ব-বৃক্ষের কাণ্ড পর্য্যন্ত বকযন্ত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। কোন স্থানে কোন বিলাসী নাগরিকের বিশাল পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। উৎসবের দিবসে নৃত্যগীত ও হাস্য কোলাহলে বস্ত্রাবাস পরিপুরিত হইয়া উঠিয়াছে, সুরার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। পথে দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকা-গণ অর্চ্চনান্তে স্নানার্থ নদীতীরে চলিয়াছে। নদীবক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ জলযান নানাভরণভূষিত হইয়া মহোৎসবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নদীবক্ষে উৎসবের স্রোত সমভাবে প্রবাহিত, নদীতীর্থের পথ নাগরিক-গণের পাদপেষণে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র নদীর জল বহু লোকের সমাগমে মলিন হইয়া উঠিয়াছে। নদীবক্ষেও ক্ষেপনী হস্তে উৎসব-বিহ্বল তরুণ ও তরুণী, বৃদ্ধ ও বালক। নদীর সান্নিধ্যে বৃক্ষতলে কোন স্থানে চীবরধারী ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিতেছেন, মুণ্ডিত-শীর্ষ উপাসক ও উপাসিকাগণ "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আজীবন সঞ্চিত কলুষ-রাশি ক্ষয়ের চেষ্টা করিতেছেন। কোন স্থানে স্থবির ও ত্রৈপিটকো-পাধ্যায়গণ অভিধর্ম্মকোষব্যাখ্যা ও অভিধর্ম্মবিভাষাশাস্ত্রের কূটতর্ক লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। এইরূপে দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহরের মধ্যে উৎসব ক্ষণেকের জন্য স্থগিত হইল, সকলেই আহারের চেষ্টায় ব্যস্ত হইল। বৃহৎ পটমণ্ডপে রাজা ও রাজ্ঞী-গণ সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারের আয়োজন করিয়াছেন। মর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে ভিক্ষু ও স্থবিরগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, রাজা, বৃদ্ধ মহাস্থবির ও নবাগত শ্বেতাঙ্গপুরুষ তখনও অভুক্ত অবস্থায় আছেন, তাঁহারা ভোজনব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ভিক্ষুগণের আহার

শেষ হইলে সকলে পুনরায় স্তূপবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তখন দিবাকর অস্তমিত প্রায়। ইতিমধ্যে পরিচারিকাগণ আমাদিগের পুষ্পসজ্জা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, নানাবিধ কাচ ও স্ফটিক নির্ম্মিত দীপ ও পাত্র আনীত হইয়াছে, কারণ সন্ধ্যা সমাগমে স্তূপে দীপোৎসব হইবে। ক্রমে সমগ্র স্তূপবেষ্টনী ক্ষুদ্র প্রদীপমালায় সজ্জিত হইল, স্থানে স্থানে উল্কাশ্রেণী সন্নিবিষ্ট হইল; বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার জন্য স্তূপীকৃত ইন্ধন সংগৃহীত হইল। একে একে সপরিবারে সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ সুসজ্জিত হইয়া বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; নানা রত্নখচিতা সর্ব্বাভরণভূষিতা, বিচিত্র বেশধারিনী পুরাঙ্গণা-গণের একত্র সমাবেশে ভীষণাকার পাষাণবেষ্টনী পুনরায় যেন কুসুম সজ্জায় সজ্জিত হইল।

সন্ধ্যাসমাগমে সমগ্র প্রান্তর আলোকমালায় ভূষিত হইল, প্রতি পটমণ্ডপে, বস্ত্রাবাসে, প্রতি পর্ণকুটীরে প্রদীপশ্রেণী প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রান্তরের স্থানে স্থানে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত হইল। রাজপুরুষগণের আদেশে প্রান্তরের বৃক্ষগুলি পর্য্যন্ত আলোকমালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। স্তূপের ও বেষ্টনীর আলোকগুলি প্রজ্জ্বালিত হইলে মনে হইল, যেন চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডল ইতস্ততঃ উল্কানিক্ষেপ করিতে করিতে নগরপ্রান্তে প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দীপোৎসবের সহিত উৎসবের স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল, সুরা ও তাম্বুলের বিপণিতে প্রবেশলাভ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। রজনীকালে আলোকমালা ও জনসঙ্ঘের কোলাহলের ভয়ে নিশাচরগণ বহুদূরে পলায়ন করিল। সন্ধ্যা অতীত হইলে রাজা ধনভূতি মহিষীসমভিব্যাহারে স্তূপের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন। গর্ভমধ্যে মহাস্থবির ও নবাগত

শ্বেতাঙ্গপুরুষ পূর্ব্ব হইতে আসীন ছিলেন। রাজা ও রাজ্ঞীগণ আসন গ্রহণ করিলে নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সকলকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা হইতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল।

তিনি বলিলেন, মহারাজ প্রিয়দর্শী ত্রিংশদ্বর্ষকাল চেষ্টা করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে যত স্থানে ভগবান শাক্যের শরীর ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শীর দেহাবসানের পর তথাগতের শরীর দর্শন মগধবাসী ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। আমরা বহু চেষ্টায় উদ্যান প্রদেশে একটী শরীরনিধান হইতে কিয়দংশমাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মৌর্য্যরাজবংশের অধঃপতনের পর যখন বন্যার স্রোতের ন্যায় শকতাড়িত যবনজাতি বাহ্লীক হইতে আসিয়া কপিশা ও উদ্যান অধিকার করিয়াছিল, তখনও শরীরগর্ভে অনেক চৈত্যস্তূপাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কারণ যবনগণ তখনও সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হয় নাই বা এতদ্দেশবাসিগণের সহিত সহানুভূতি করিতে শিক্ষা করে নাই। অধুনা যবনগণ এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে শিখিয়াছে, সুতরাং বিদেশীয়গণের অধিকারে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সদ্ধর্ম্মের উন্নতি অতি অল্প কালমাত্র আরব্ধ হওয়ায় তাহার বাহ্যলক্ষণ এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। সদ্ধর্ম্মের অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, হয় ত তাহাও সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। তক্ষশিলা মহাবিহারের অধিকারে ত্রিংশদ্বর্ষ যাপন করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছি, তক্ষদত্তের পুত্র সিংহদত্তকে শতদ্রু নদীতীর হইতে সুবস্তুনদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত সকলেই কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মৈত্রেয়নাথের অনুকম্পাবলে আমি গৌতমের শরীরাংশ লাভে সমর্থ

হইয়াছি। মহারাজ! যিনি আপনার নগরে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি আর্য্যাবর্ত্তে মহাস্থবিরগণের স্থবির, অর্হৎপাদ ও বোধিসত্ত্বপাদ।

অর্দ্ধশতাব্দী অবনতির পরে সদ্ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি বিশ্বাসিগণের সুষুপ্ত মমতা জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছে যিনি মৌর্য্যাধিকার কালে মহাসঙ্ঘের প্রকৃত গৌরব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই চেষ্টায় এই মহানুষ্ঠান সফল হইয়াছে। তিনি সমগ্র বৌদ্ধজগতের প্রণম্য, তাঁহারই আদেশে আমি তক্ষশিলা হইতে তথাগতের শরীরাংশ লইয়া, শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্তে, ধনভূতির রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহারই আদেশে যবন রাজ্য হইতে যবন শিল্পী প্রেরিত হইয়াছে এবং তাঁহারই আদেশে সত্যধর্ম্মের বিশ্বাসিগণ প্রাণপণ শক্তিতে স্তূপ নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। মহাস্থবির নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষের বাক্যে লজ্জিত হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধনভূতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আপনি তক্ষদত্তপুত্র সঙ্ঘস্থবির সিংহদত্তের প্রকৃত পরিচয় অবগত নহেন। অদ্য যিনি তথাগতের শরীরভার বহন করিয়া তক্ষশিলা হইতে আটবিক মহাকোশলে আসিয়াছেন। তিনি এককালে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যভাগের অধিকারী ছিলেন। বিতস্তা নদীতটে ইঁহারই পূর্ব্বপুরুষ নবাগত যবন রাজের অব্যাহত গতি প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজিত হইয়াও যিনি পৌরববংশের গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সিংহদত্তের পূর্ব্বপুরুষ। শকতাড়িত যবন প্লাবনে যখন সমগ্র পঞ্চনদে আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন স্বাধিকারচ্যুত হইয়া সিংহদত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তাহার পর ত্রিংশদ্বর্ষকাল অতীত হইয়াছে এখন সিংহদত্ত তক্ষশিলা সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি যখন তীর্থপর্য্যটনে টক্কদেশে গিয়াছিলাম, তখন সিংহদত্ত শিশু; তিনি পৌরবজাতির অগ্রণী তক্ষদত্তের একমাত্র পুত্র। কুমারপাদ সিংহদত্তের বয়ঃক্রম এখন ষষ্টি বর্ষের অধিক হইবে। সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি যবন রক্তে শতদ্রুতীর হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্লাবিত করেন নাই বটে, তিনি পৌরবজাতির সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী অধিকারচ্যুত হইয়াছেন বটে; কিন্তু সমগ্র পঞ্চনদ আজ তাহার যশঃসৌরভে পরিপূর্ণ। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে অন্যবিধ বিজয়-গৌরবের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আসুরিক বলে যবনের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি মানসিক বলে সমগ্র যবনজাতিকে পদানত রাখিয়াছেন। যাহারা সাকেত ও মাধ্যমিক পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে, তাহারা অবশেষে তক্ষশিলার সিংহদত্তের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়াছে। কপিশা হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত, গান্ধার হইতে শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত এই তরুণ মহাস্থবিরের মানসিক বলে বিজিত হইয়াছে। আজ সদ্ধর্ম্মের উন্নতির অঙ্কুর মাত্র দেখা দিয়াছে, আমি শতাধিক বর্ষকালব্যাপী ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করিতেছি। অধিকতর উন্নতির সময় অদূরবর্ত্তী। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সূচনায় আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমপ্রান্তে যে মেঘ দৃষ্ট হইয়াছিল, মৌর্য্যরাজ্যের অবসানে, সেই মেঘোৎসৃষ্ট প্লাবনে মুমূর্ষু সঙ্ঘে পুনরায় বলসঞ্চার হইয়াছে, পুনরায় পশ্চিম প্রান্তে মেঘ দেখা দিয়াছে, কুরুবর্ষে আর্য্যজাতির ও বাহ্লীকে যবনজাতির অধিকার লুপ্ত হইয়াছে, উত্তরমরু হইতে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় শকজাতি আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরখণ্ড আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্ষণেকের জন্য মহানদী শকপ্লাবন রুদ্ধ করিয়াছে। বাধা প্রাপ্ত হইয়া স্রোতের শক্তি

দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যেদিন এ স্রোতোবেগ বন্ধনমুক্ত হইবে, সেই দিন ইহা অবাধ গতিতে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থান প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। বন্যার গতি যবনপ্লাবনের ন্যায় শতদ্রুতীরে রুদ্ধ থাকিবে না, ইহার বেগ প্রবলতর; প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা প্লাবনে ভাসিয়া যাইলেও যাইতে পারে; যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে মহদুপকার সাধিত হইতে হইবে। কারণ, মরুবাসী জাতিসকল যখন প্রাচীন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তদ্দেশের আদিম অধিবাসিগণ যদি একেবারে অভিভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা শীঘ্রই পুনরায় আধিপত্যের কিয়দংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। মরুবাসী বর্ব্বরগণ সত্বরই নূতন দেশের প্রাচীন সভ্যতার নিকট নতশীর্ষ হইয়া থাকে। যদি সদ্ধর্ম্মের অঙ্কুরমাত্রও পঞ্চ নদে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কালে সমগ্র শকজাতি ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি, মানব জীবনের পরিমাণ অতিক্রম করিয়াছি, আমার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ; কিন্তু আমি অনুভব করিতে পারিতেছি, যে সদ্ধর্ম্মে উন্নতির দিন আসিতেছে। সে দিন সুদূর নহে, সদ্ধর্ম্মের নবীনগৌরব মৌর্য্যাধিকারকালে লুপ্তপ্রায় গৌরবাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইবে। আমার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, আমার জন্ম অদ্যাপি শেষ হয় নাই, সুতরাং আমাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, আমার দেহ পরিবর্ত্তনের সময় আসন্নপ্রায়। কিন্তু যাহারা থাকিবে তাহারা দেখিবে,—সদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থান কাল সমাগত প্রায়। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, আর্য্যাবর্ত্তে এমন বল নাই যে, তৎকর্ত্তৃক শকজাতির আক্রমনের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতিরুদ্ধ হয়। শিক্ষার ও দূরদর্শিতার অভাবে

আর্য্যাবর্ত্তের রাজাগণ আসন্ন বিপৎপাত সম্বন্ধে চিন্তাশূন্য। যখন শকজাতি আক্রমণ করিবে, তখন রাজন্যবর্গ একে একে সকলেই বিনষ্ট হইবে। ইহার পর মহাস্থবির তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সিংহদত্ত কহিলেন, মহারাজ! সযত্নরক্ষিত তথাগতের শরীরাংশ আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। যদি কোন দিন রাজ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, যদি আপনার রাজ্যে আপনার রাজ্যবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্মে বীতরাগ হয়, তাহা হইলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনি বা আপনার উত্তরাধিকারিগণ আমাদিগের শরীরাংশ আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। তক্ষশীলা মহনগরীর মহাবিহারের অধ্যক্ষ যিনি থাকিবেন তিনি সাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন। সিংহদত্ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, যেদিন নগরবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে, তাহার বহু-পূর্ব্বে হূণগণের পরশুর আঘাতে তক্ষশিলার ভিক্ষুগণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে; বিশাল মহাবিহারের অগ্নিদগ্ধ ভস্মাবশেষ বায়ুভরে সিন্ধু তীরে উপনীত হইবে। যেদিন শরীরনিধানের উপরে মহাভার স্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেদিন তক্ষশিলা নগরীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না; খস্, হূণ, দরদবংশজাত মেষপাল মহাবিহারের ধ্বংসবিশেষের উপরে সানন্দে মেষচারণ করিবে; তক্ষশিলা নগরীর নাম পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে শ্রুত হইবে না।

রাজা, সিংহদত্ত, মহাস্থবির ও রাজ্ঞীগণ গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলে সশব্দে শিলাখণ্ড দ্বয় স্বস্থানে আসিল। তখন উৎসব আমোদ থামিয়া আসিয়াছে, দীপমালা নির্ব্বাণোন্মুখ, হিমকণস্পৃষ্ট শীতলবায়ু নিদ্রালস নাগরিকগণকে স্পর্শ করিতেছে, অধিকাংশ ব্যক্তি নগরাভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছে; বিপণিশ্রেণী যেন ইন্দ্রজালবলে অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল-

সুরাপানোন্মত্ত নাগরিক ও বারাঙ্গণাগণের দেহ মৃতদেহের ন্যায় পথে পথে লুণ্ঠিত হইতেছে। চিন্তাভারাবনতদেহে নিঃশব্দে সকলে রথারোহণে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট প্রদীপগুলি পরিচারকগণ নির্ব্বাপিত করিল। যে সকল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। রক্ষিগণ ব্যতীত বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। ক্রমশঃ বায়ু বহিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথে শয়ন করিয়া যাহারা তখনও উৎসবের আমোদ ভোগ করিতেছিল, তাহারা আশ্রয়ানুসন্ধান করিতে বাধ্য হইল। ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে আর্ত্তিমিদোর অনাবৃত দেহে স্তূপবেষ্টনীর দক্ষিণ তোরণে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, মুসলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। কাহার প্রতীক্ষায় যবনশিল্পী নিদ্রা ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা আর বুঝা গেল না।

---

[৬]

পরদিন প্রভাতে অধিকাংশ নগরবাসী অর্চ্চনা করিবার জন্য স্তূপে আসিল। হিমকণ-ধৌতহেমন্তপ্রভাতে নবজাত সূর্য্যকরস্নাত হইয়া দলে দলে কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত নগরবাসী স্তূপ দর্শন, প্রদক্ষিণ ও অর্চ্চন করিয়া গেল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, নবনির্ম্মিত স্তূপের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; নানাদেশ হইতে জনসঙ্ঘ স্তূপ দর্শন করিতে আসিল। এইরূপে নবাগতের কোলাহলে কিছুকাল কাটিয়া গেল। কাল-নিরূপণ করিবার ক্ষমতা আমার যদি থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত স্তূপের ইতিবৃত্ত বলিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে ক্ষমতা আমার নাই। আমার জন্মের প্রথম দিবস হইতে, চিত্রশালায় আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলিতে পারি, কিন্তু কোনও ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিছুকাল গত হইলে যখন স্তূপ পুরাতন হইল, তখন দর্শকের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিল। প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিত সংখ্যক স্থবির ও স্থবিরা স্তূপদর্শন করিতে আসিতেন। কচিৎ কখনও দূরদেশাগত তীর্থযাত্রী তথাগতের শরীর দর্শন মানসে নগরে আসিতেন। সেই দিন বৃদ্ধ মহাস্থবির মহোল্লাসে গর্ভগৃহের দ্বারোন্মোচন করিতে আসিতেন। তিনি স্তূপবেষ্টনীর বহির্ভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিত সঙ্ঘারামে বাস করিতেন। একদিন দেখিলাম, পুষ্পচন্দনশোভিত মহাবৃদ্ধ মহাস্থবিরের শবদেহ ভিক্ষুসঙ্ঘ নগরাভিমুখে লইয়া গেল। নগরে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। প্রান্তর-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র নদীতীরে প্রাচীন মহাস্থবিরের দেহ ভস্মীভূত হইল। এক-দিন শুনিলাম, সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ রাজপ্রাসাদে আহূত হইয়াছেন,

রাজা ধনভূতির অন্তিমকাল উপস্থিত। ধনভূতির মৃত্যু হইল। তাহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল, তক্ষশিলা হইতে সিংহদত্তের নির্ব্বাণলাভের সংবাদ আসিল। তাহার পরই প্রলয় ঝটিকা উত্থিত হইল।

পতনোন্মুখ যবনজাতিকে, বোধ হয়, সিংহদত্তই দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বভাষাচ্যুত যবনজাতির মধ্যে একতার অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। সিংহদত্তই বন্ধনরজ্জুর ন্যায় কাষ্ঠখণ্ডগুলি একত্র রাখিয়াছিলেন। সেই রজ্জুর প্রভাবেই যবনগণ শকজাতির প্রথম আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শকদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় শকজাতি দলে দলে মহানদী পার হইতেছে, মহানদী আর শকযবনাধিকারের সীমা নাই। কপিশায় শকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গান্ধার, উদ্যান, উরস ও টক্কদেশে যবনরাজগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও সিংহদত্তের জন্য—সিংহদত্তের প্রভাবে। সিংহদত্তের অবর্ত্তমানে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে, সে চিন্তা মধ্যদেশের রাজগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। প্রাচীন পৌরবরাজ্যের অধঃপতনে তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছিলেন, স্বধর্ম্মত্যাগী সিংহদত্তের প্রভাববৃদ্ধিতে তাঁহারা ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহদত্ত তাঁহাদিগের জন্য কি করিতেছেন, সিংহদত্তের অভাবে তাঁহাদিগের কি উপায় হইবে, কুরুক্ষেত্র হইতে পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত কোন রাজাই সে বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। সিংহদত্তের অভাব হইলে মথুরার অধিকারবঞ্চিত হইয়া রামদত্ত সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, আজ বর্ষীয়ান্ পৌরবমহাস্থবির জীবিত থাকিলে শকগণকে সুবস্তু নদী পার করিয়া রাখিয়া আসিতাম।

প্রতিদিন পূর্ব্বতোরণের নিম্নে বসিয়া স্তূপসংলগ্ন সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ আর্য্যাবর্ত্তের বর্ত্তমান অবস্থার কথার আলোচনা করিতেন। তাঁহাদিগের নিকটই শুনিতাম যে, মহাসমুদ্রের উর্ম্মিরাশির ন্যায় শকজাতি আর্য্যাবর্ত্ত আচ্ছন্ন করিতে আসিতেছে, সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে আর আর্য্যাধিকার নাই। বাহ্লীকের যবনরাজ্য ধ্বংস হইলে পারদরাজগণ শকপ্লাবনস্রোত রোধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুদূর যোন-দ্বীপে ও মিস্রাইমে আন্তীয়োক ও তুরময় বংশীয় রাজগণ শকজাতির আক্রমণভয়ে কম্পিত হইতেছেন, শকজাতির গতিরোধের চেষ্টায় চারিজন পারদরাজ জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছেন, পঞ্চমের জীবন সঙ্কটাপন্ন। শক-স্রোত ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল। উপনগরবাসী জনৈক ব্যক্তি জালন্ধরে শকসৈন্য দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট হইতে শকজাতির বিবরণ শুনিবার জন্য কৌশাম্বী হইতে রাজদূত আসিয়াছে। ক্রমশঃ শ্রুত হইল, মথুরায় রামদত্ত ও ত্রিগর্ত্তে উত্তমদত্তের অধঃপতন হইয়াছে; অতি প্রাচীন চেদি রাজবংশ মৎস্যদেশের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। একদিন সংবাদ আসিল যে, শকসৈন্য নগর অধিকার করিতে আসিতেছে। নগরের কথা বলি নাই। ধনভূতির শিশু পুত্র যথাসময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত, জরাগ্রস্ত ও কালকবলিত হইয়াছেন। তাঁহার পর তদ্বংশের অপর রাজদ্বয় সিংহাসন অধিরোহণ করিয়াছিলেন। শক আক্রমণকালে যিনি নগরাধিপতি ছিলেন তাঁহার সদ্ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। তখন আর্য্যাবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যবাসী অন্ধ্রজাতির অধিকার, সদ্ধর্ম্মদ্বেষী সুঙ্গবংশের অধঃপতন হইয়াছে। তৎপদানুবর্ত্তী অহিচ্ছত্রবাসী বিশ্বাসঘাতক কাণ্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণও নির্ম্মূল হইয়াছে; আর্য্যাবর্ত্তের রাজচক্রে শিথিলতা প্রবেশ করিয়াছে। পাটলিপুত্রে অন্ধ্ররাজের জনৈক কর্ম্মচারী বাস করেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা

মগধের বহির্দ্দেশে লক্ষ্য হয় না। যে দিন সংবাদ আসিল, শকরাজের বিপুল বাহিনী নগর হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছে, সেদিন নগরাধিপতির সত্য সত্যই ঘোর দুর্দ্দিন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরে সুঙ্গরাজগণ কিয়ৎ পরিমাণে করদরাজগণকে সম্রাটের প্রভাব অনুভব করাইতে পারিতেন; কিন্তু পরবর্ত্তী রাজগণ এককালীন ক্ষমতাহীন ছিলেন, নামে মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত অন্ধ্রসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। অধিকাংশ আর্য্যাবর্ত্তবাসী অন্ধ্র কি তাহা জানিত না; কেহ কেহ বলিত তাহারা ক্ষত্রিয়জাতীয়, কেহ বা বলিত, তাহারা দস্যু। দাক্ষিণাত্যের কোন নিভৃত উপত্যকায় অন্ধ্ররাজের রাজধানী অবস্থিত ছিল, আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ নগরে, তাহা অনেকেই অবগত ছিলেন না। যে দিন শ্রুত হইল যে, পঞ্চাশৎ সহস্র শক অশ্বারোহী নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে, সেদিন নগরাধিপতিকে সাহায্য করে এমন ব্যক্তি কেহই ছিল না। আসন্ন বিপৎ শঙ্কায় ব্যাকুল নরনারী দলে দলে নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিল, সঙ্ঘারাম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুগণ উজ্জয়িনীর পথে প্রস্থান করিলেন, নগরে এমন লোক রহিল না যে, নগর প্রাকার রক্ষা করে। শকসৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া শুক্লবসনপরিহিতা রাজমাতা বুদ্ধের শরীরনিধান সম্মুখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন; মুষ্টিমেয় শরীররক্ষী লইয়া তরুণ রাজা শকসৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাহারা নগর ত্যাগ করিয়া যায় নাই তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সুশিক্ষিত রণদক্ষ সৈন্য, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা এত সামান্য যে, পঞ্চাশৎ—সহস্র অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে তাহারা একপদ তিষ্ঠিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

পরদিন প্রভাতে নগর নিস্তব্ধ, জনশূন্য। প্রান্তরে কৃষক হলকর্ষণ করিতে বা মেষপাল চারণ করিতে আসে নাই। প্রতিদিন প্রত্যূষে সঙ্ঘারামবাসী

ভিক্ষুগণ তথাগতের শরীর অর্চ্চনা করিতে আসিতেন, কিন্তু সেদিন বেষ্টনী, স্তূপ ও গর্ভগৃহ জনশূন্য, গর্ভগৃহ মধ্যে মৃতপ্রায়া রাজমাতা শরীর-নিধানের সম্মুখে ধূলিতে লুটাইতেছেন। বহুদূরে বহু অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল, ক্রমে উত্তরে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শকসৈন্যের পুরোভাগ দৃষ্ট হইল, দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রান্তরস্থিত নদীতীরে আসিয়া উপনীত হইল। তখন নবোদিত সূর্য্যের কিরণমালা আসিয়া স্তূপের উচ্চচূড়া কেবল স্পর্শ করিয়াছে। রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সুগঠিত স্তূপ ও বেষ্টনী দেখিয়া একবার যেন তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সুশিক্ষিত বলবান অশ্বগণ এক এক লম্ফে ক্ষীণকায়া নদী পার হইয়া আসিল। তাহাদিগের উজ্জ্বল লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ প্রভাতসূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেই কৃষ্ণবর্ণ মেষচর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, অদৃষ্টপূর্ব্ব আয়ুধসমূহ ও ঘোর রক্ত বর্ণ মুখমণ্ডল অত্যন্ত ভয়াবহ। সমান্তরালে পংক্তির পর পংক্তি অশ্বারোহী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল, দ্বিলক্ষ অশ্বখুরোত্থিত ধূলিতে প্রান্তর অন্ধকার হইয়া গেল, সর্ব্বশেষ পংক্তি শত্রুর সন্ধানে স্তূপ-বেষ্টনী অভিমুখে আসিল। বেষ্টনী ও সঙ্ঘারাম তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী তোরণপথে প্রদক্ষিণের মধ্যে প্রবেশ করিল, অশ্বপদশব্দে ত্রস্তা রাজমাতা যেমন গর্ভগৃহ হইতে বহির্গতা হইতে যাইবেন, অমনই জনৈক অশ্বারোহীনিক্ষিপ্ত অষ্টহস্ত পরিমিত শূল তাঁহার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিল। তাঁহার মৃতদেহ গর্ভগৃহ মধ্যে পতিত হইল। স্তূপ খননকালে সুবর্ণখচিত বহুমূল্য কৌষেয় বস্ত্রজড়িত রাজমাতার অস্থিনিচয় তোমরা পাইয়াছিলে; অবজ্ঞা করিয়া তাহা সংগ্রহশালায় উঠাইয়া আন নাই, পলিতকেশ শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের উপদেশ অবহেলা করিয়াছিলে। তখন যদি উহার কাহিনী জানিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা সাদরে সংগ্রহ

করিয়া লইয়া আসিতে। শকসৈনিক নিক্ষিপ্ত শূল রাজ্ঞীর বক্ষবিদীর্ণ করিয়া মেরুদণ্ডে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, শূলের ফলক ও তৎসংলগ্ন অস্থিখণ্ড এখন বর্ব্বরগ্রামে উপাসনার সামগ্রী হইয়াছে, অবশিষ্ট অস্থিখণ্ড ও বহুমূল্য বস্ত্রের অবশেষ ধূলায় মিশাইয়া গিয়াছে। নগরধ্বংসের পরদিন সংঙ্ঘারামের জনৈক প্রাচীন পরিচারক অতি সন্তর্পণে আসিয়া স্তূপ বেষ্টনী ও সঙ্ঘারাম সন্ধান করিতে লাগিল ; গর্ভগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল যে, শূলের কাষ্ঠদণ্ডের অর্দ্ধভাগ দ্বারের বাহিরে রহিয়াছে, দ্বারদেশে ধূল্যবলুণ্ঠিত প্রাণশূন্য দেহ পতিত রহিয়াছে। বহু যত্নেও সে দেহ হইতে শূল মোচন করিতে পারিল না ; তাহার জীর্ণ দেহে ক্ষীণ হস্তে এমন বল ছিল না যে, মেরুদণ্ডে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত বৃহৎ শূল টানিয়া বাহির করে। সে ধীরে ধীরে মৃতদেহ উঠাইয়া গর্ভগৃহের এক কোণে স্থাপন করিল ও সঙ্ঘারাম হইতে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ আনিয়া মৃতদেহের জন্য আধার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। আধার প্রায় নির্ম্মিত হইয়াছে, এমন সময় দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল ; কাষ্ঠ ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পরিচারক পলায়নোন্মুখ হইল, স্তূপের বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, একজন মাত্র অশ্বারোহী স্তূপাভিমুখে আসিতেছে ও তাহার উষ্ণীষ ভারতবাসীর ন্যায়। তখন সে আশ্বস্ত হইয়া প্রতীক্ষায় তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান হইল ; অশ্বারোহী নিকটে আসিলে পরিচারক তাহাকে চিনিতে পারিল, সে নগররক্ষী জনৈক সৈনিক, তাহার সহিত নগরের পতন সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। অবশেষে তাহার সাহায্যে রাজ্ঞীর দেহ বৃহৎ কাষ্ঠাধারে আবৃত করিয়া উভয়ে কাষ্ঠাধার গর্ভগৃহের এক কোণে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। গর্ভগৃহের দ্বার কিয়ৎকালের জন্য রুদ্ধ হইল। সৈনিক কহিয়াছিল, ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় শকসৈন্য নগর প্রাচীরের উপর পতিত হইয়া

ছিল, অবলীলাক্রমে পরিখা ও প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। নগররক্ষীরা কেহই জীবিত নাই, একজন চলচ্ছক্তিবিহীন বৃদ্ধ ভিক্ষু দক্ষিণ নগর-তোরণের আকাশকক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছেন। কয়েকজন নগরবাসী নগরধ্বংসের পর আসিয়া মৃতদেহের সৎকার করিয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই পার্ব্বত্যভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শকগণের অত্যাচারের আশঙ্কায় কেহই সমতল ভূমিতে আসিতে চাহে না।

দিনের পর দিন যায়, আমাদিগের নিকটে আর মানব সমাগম হয় না। ক্রমে প্রদক্ষিণের পথ তৃণসঙ্কুল হইয়া উঠিল, বেষ্টনীর মধ্যে ও প্রান্তরে নির্ভয়ে মৃগযূথ বিচরণ করিতে আসিত, কিছুকাল পরে দৃষ্ট হইল, নগরে ও নগর-প্রাকারে মহাকায় বৃক্ষ সকল জন্মিয়াছে, পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত নগর দেখিলে বোধ হইত যেন উহা কোন শ্রেষ্ঠির সুরক্ষিত উদ্যান। ক্রমে প্রান্তরেও বৃক্ষ জন্মিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নগর আর নয়ন-গোচর হইত না। আমার পার্শ্বে একটি লতা জন্মিয়াছিল, দারুণ নিদাঘ উত্তাপেও আমার ছায়া পাইয়া সে জীবিতা ছিল, সে অনেক কথা কহিত, কিন্তু তাহার ক্ষীণস্বর আমার কর্ণ পর্য্যন্ত আসিত না। সেই জন্যই বোধ হয় সে বেষ্টনীর স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আমার নিকটে উঠিয়া আসিল। সে আসিয়া আমার পরুষ দেহ বেষ্টন করিয়া রহিল। সে যতদিন ছিল তত-দিন তাহাকে অতীতের কথা বলিতাম, সে শুনিয়া বিস্মিতা হইত। তাহার জীবনে সে কখন মনুষ্য দেখে নাই, সুতরাং শ্বেত, কৃষ্ণ ও মিশ্রবর্ণের কথা শুনিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইত। একটি ক্ষুদ্র অশ্বত্থবৃক্ষ স্তূপশীর্ষস্থ ছত্রের উপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষ মহাকায়

মহীরুহে পরিণত হইল। তাহার ভারে এক বর্ষা রজনীতে সশব্দে সপ্তছত্র সমন্বিত স্তূপশীর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন মৃগযূথ আসিয়া আমার সঙ্গিনী লতিকার অধোদেশ ভক্ষণ করিয়া গেল, সে দারুণ মৃত্যু যাতনায় কাঁদিয়া উঠিল। মৃগযূথ নিঃশব্দে তৃণবংশধ্বংস করিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না। ধরাশায়ী অশ্বত্থের শাখাপ্রশাখা গুলি কম্পিত হইয়া সমবেদনা জানাইল ও কহিল, আমরাও অনুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। দুই তিন দিন সূর্য্যতাপে লতিকাও শুকাইয়া গেল, পরে সংস্কারকালে মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের পরিচারক আসিয়া তাহার অবশেষ দূরে নিক্ষেপ করিল।

একদিন মধ্যাহ্নে বহুদূরে হস্তিপদশব্দ শ্রুত হইল। অতীতকালে যে দিকে নগরোপকণ্ঠ ছিল সেই দিক হইতে ক্রমাগত মহাবৃক্ষ সমূহের পতন-শব্দ, শুষ্ক পত্রসমূহের মর্ম্মরধ্বনি ও বেতসলতার উৎপাটন শব্দ আসিতে লাগিল। ভয়ে বনবাসী জীবজন্তুসমূহ স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল। বেলা তৃতীয় প্রহরে বনমধ্য হইতে চারিটি হস্তী কতিপয় মনুষ্যকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। ক্রমে হস্তিচতুষ্টয় আসিয়া তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলে সকলে অবতরণ করিলেন, দেখাগেল তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন মেষ-চর্ম্মাচ্ছাদিত, দুই জন মলিনকাষায় পরিহিত ভিক্ষু ও একজন উজ্জ্বল বর্ম্মা-বৃত যোদ্ধা, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক হস্তীর স্কন্ধদেশে এক একজন হস্তিপক উপবিষ্ট ছিল। বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা অধিকদূর আসিতে পারিলেন না, কারণ পদে পদে বেতসলতা তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ইহার মধ্যে তাঁহাদিগের কথোপকথনে বুঝিলাম, মেষচর্ম্মপরিহিত ব্যক্তিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ নগরে বাস করিতেন, শক আক্রমণে তাঁহারা পর্ব্বতসঙ্কুল

প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহাদিগের বংশধরেরা কেহই উপত্যকাভূমি পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয়েন নাই। শকজাতি আর ভ্রমণশীল নাই, তাহারা আর্য্যাবর্ত্তে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, নবাগত কুষণ বা গুষণ বংশ সমস্ত শকজাতিকে একত্র করিয়া অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। কণিষ্ক কুরুবর্ষ হইতে দাক্ষিণাত্যের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডের অধিকারী। আরও বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ শকজাতি সদ্ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছে। দেবতাদিগের প্রিয় মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শীর ন্যায় কণিষ্ক সদ্ধর্ম্মের পোষণকর্ত্তা হইয়াছেন। আবার জম্বুদ্বীপ হইতে চীন, কিরাত, মরু, ঐরাণ প্রভৃতি দেশে ভিক্ষুগণ সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সদ্ধর্ম্মের প্রাচীন তীর্থগুলির উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। কপিলবাস্তুতে, মহা-বোধিতে, বারাণসীতে, কুশীনারে, শ্রাবস্তীতে, বৈশালীতে, কৌশাম্বীতে সঙ্কাশ্যে, বিদিশায়, মথুরায়, জালন্ধরে, তক্ষশিলায়, নগরহারে, পুরুষপুরে, কপিশায় ও বাহ্লীকে সদ্ধর্ম্মের সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। কত পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল! উৎসবের দিন কপিলবাস্তু হইতে লুম্বিনী গ্রামের মৃত্তিকা লইয়া একজন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন, পাটলি-পুত্রবাসী কোন মহাপুরুষ স্তূপনির্ম্মাণকালে বিশেষ সাহায্য করিয়া ছিলেন, মহাবোধি হইতে একজন বর্ষীয়ান ভিক্ষু বোধিদ্রুমবংশজ ক্ষুদ্র অশ্বত্থবৃক্ষ আনিয়া স্তূপবেষ্টনীর বহির্ভাগে রোপণ করিয়াছিলেন। বিদিশা-নগর হইতে বহুদূর নহে, যাঁহারা বিদিশায় সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের শরীরনিধান-বিহারে রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন উৎসবের দিন আসিয়াছিলেন। মথুরায় ধনভূতির পিতা স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভ ও সূচীদানে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছিলেন। তক্ষশিলা

হইতে সিংহদত্ত আসিয়াছিলেন। সিংহদত্ত ও মহাস্থবিরের কথা মনে পড়িয়াগেল। তক্ষশিলার মহাবিহারের তখন কি অবস্থা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার ভাষা বুঝিবার শক্তি থাকিলে তাহারা নিশ্চয়ই উত্তর দিত, কারণ আমি এখন যে ভাবে কথা বলিতেছি চিরকালই সে ভাবে বলিয়া আসিয়াছি, আমার কথা কখনও ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর হয় নাই।

শুনিলাম স্তূপের ও বেষ্টনীর সংস্কার হইবে, তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য মহাবনের মধ্যে পথ প্রস্তুত হইবে, সেই পথে রাজাধিরাজ দেবপুত্র বাহিকণিষ্ক স্তূপ দর্শনে আসিবেন। ক্রমে দিবাবসান সময় আগত দেখিয়া আগন্তুকগণ প্রস্থান করিলেন। মলিন কাষায় পরিহিত ভিক্ষুগণ এখন উপত্যকাবাসী জনপদের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন, মেষচর্ম্মপরিহিত ব্যক্তিদ্বয় নগরবাসিগণের বংশজাত, কিন্তু বর্ম্মাবৃত পুরুষ বিদেশীয়; তিনি শকসাম্রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, রাজাদেশে তথাগতের শরীর গর্ভস্তূপের অন্বেষণে আসিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতে বনের মধ্যে মহাকায় প্রাচীন বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইতে লাগিল, সে পথ তোমরা দেখিয়াছ। বর্ব্বর রমণীগণ এখনও শুষ্ক করিবার জন্য সেই সকল পাষাণে গোময় লেপন করিয়া থাকে। পথ নির্ম্মিত হইলে স্তূপ ও বেষ্টনী পরিষ্কৃত হইল, ক্রমে বনের একাংশে শ্রমজীবিগণের একটি গ্রাম বসিয়া গেল; স্তূপ-সংস্কার আরম্ভ হইল। অশ্মাচ্ছাদিত নবনির্ম্মিত পথে একদিন মধ্যাহ্নে চক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি শ্রুত হইল। আমরা শকটের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম; ভাবিলাম, বোধ হয় রাজা আসিতেছেন। কিন্তু দুই প্রহর কাল অতীত হইলে দৃষ্ট হইল বৃহদাকার শকটে স্থাপিত রক্তবর্ণ প্রস্তর স্তূপা-ভিমুখে আসিতেছে, হস্তিদ্বয় প্রত্যেক শকট লইয়া আসিতেছে। দেখিবমাত্র

চিনিতে পারিলাম, দূর হইতে তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারিলাম ; তাহারাও আমাদিগের ন্যায় রক্তবর্ণ পাষাণ। সমুদ্রগর্ভে একদিনে এক সময়ে উৎপন্ন, বহুকাল একত্র পর্ব্বতের সানুদেশে বাস করিয়াছি, তাহারা আমাদিগেরই,নূতন নহে। তাহারা বলিল যে,আমরা চলিয়া আসিবার পর বিদীর্ণবক্ষ অল্প সময়ের মধ্যেই বনরাজীতে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকাল আর কেহ তাহাদিগের অঙ্গে আঘাত করে নাই। কখনও কখনও দুই চারিজন মনুষ্য আসিয়া তাহাদিগের অঙ্গভেদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা অধিক আঘাত করে নাই। কেহ কেহ আঘাত করিয়া পাষাণ লাভে সফলকাম হইত। কেহ বা হতাশমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। অল্পদিন পূর্ব্বে মেষচর্ম্মাবৃত কয়েকজন মনুষ্য পর্ব্বতশিখর হইতে অবরোহণ করিয়া পাষাণের অবস্থা নির্ণয় করিয়া গিয়াছিল, ইহার কয়েক দিবস পরে মনুষ্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যগণ আমাদিগকে যে ভাবে ছেদন করিয়াছিল, যে নগরে আনয়ন করিয়াছিল ও যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিল, ইহাদিগকেও তদ্রূপ করিয়াছিল, তবে ইহারা ব্রাহ্মণগণ বা সদ্ধর্ম্মের অপর কোনও শত্রুর নিকট হইতে কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আমরা অনুমান করিলাম, সদ্ধর্ম্মের চিরশত্রু ব্রাহ্মণগণ মহাকোশল হইতে দূরীভূত হইয়াছে। নূতন পাষাণে স্তূপের ও বেষ্টনীর সংস্কার আবদ্ধ হইল, সপ্তচ্ছত্র-মণ্ডিত স্তূপশীর্ষ আবার গগন স্পর্শ করিল, ভগ্ন বা বিদীর্ণ প্রস্তর খণ্ডের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তর যোজিত হইল, স্বস্থানচ্যুত পাষাণ যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত হইল, স্তূপের ও বেষ্টনীর শোভা আবার যেন ফিরিয়া আসিল। জীর্ণসংস্কার কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল তাহা জানিবার জন্য সুদূর মথুরা হইতে শকসম্রাট চর প্রেরণ করিতেন, উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত সকোণ শিরস্ত্রাণ পরিহিত স্বল্পশ্মশ্রু শকজাতীয় অশ্বারোহিগণ ক্ষুদ্র

কায় পার্ব্বত্য অশ্বে আরোহণ করিয়া সংস্কারকার্য্য দেখিতে আসিত। অশ্ব পদশব্দ শ্রবণমাত্রই আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, শকরাজার দূত আসিতেছে।

স্তূপ, বেষ্টনী, প্রদক্ষিনের পথও সঙ্ঘারাম সংস্কৃত হইল। ক্রমে সঙ্ঘারামে ভিক্ষুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নানাদেশ হইতে ভিক্ষুগণ রাজানুগ্রহ লাভেচ্ছায় বনমধ্যে সঙ্ঘারামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ ক্ষুদ্রগ্রাম ক্রমে বৃহৎ গ্রামে পরিণত হইল। অপরাহ্নে ভিক্ষুগণ আসিয়া স্তূপের ছায়ায় বসিয়া কথোপকথন করিতেন, তাঁহাদিগের কথাবর্ত্তায় পৃথিবীর সংবাদ পাইতাম। শুনিলাম, হুবিষ্ক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কারণ সম্রাট চীন দেশে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। সম্রাট চীনরাজের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী চীনরাজ অবজ্ঞা ভরে তাঁহার দূতের অবমাননা করিয়াছেন। প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে কনিষ্ক চীনসাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন, আর্য্যাবর্ত্তে হুবিষ্ক পিতার জীবিতকালে রাজোপাধি ধারণ করিবেন।

বহু অর্থ ব্যয়ে স্তূপ ও বেষ্টনী সংস্কৃত হইয়াছে কিন্তু শরীরগর্ভ স্তূপে তথাগতের শরীর আবিষ্কৃত হয় নাই, গর্ভগৃহের দ্বার কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা কেহই অবগত নহে। যক্ষগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, রাজা না আসিলে গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না ও তথাগতের শরীর মনুষ্যের নয়নগোচর হইবে না। যক্ষগণের কথা সম্রাট শুনিয়াছেন, চীনযুদ্ধের আয়োজনে বিশেষ ব্যস্ত থাকিলেও তিনি আসিবেন। তিনি তথাগতের শরীর দর্শন করিয়া চীনযুদ্ধে যাত্রা করিবেন, ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে এই কথাই বার বার আলোচিত হইত।

সম্রাট আসিতেছেন। আবার উৎসব আসিতেছে, কিন্তু জীবনের

প্রথমে মানবজাতির যে উৎসব দেখিয়াছিলাম, তেমন উৎসব আর কখনও দেখিব না। বলিয়াছি, পরে কত শত উৎসব দেখিয়াছি, কিন্তু সেরূপ আনন্দ আর কখনও অনুভব করিনাই। প্রত্যেক উৎসবেই কিছু না কিছু নূতনত্ব ছিল, নূতনত্ব দেখিয়া আনন্দ হইত বটে, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী; আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনন্দভোগ আর কখনও করি নাই। কারণ বুঝিয়াছ কি? প্রথম উৎসবে মানব জাতি নূতন ছিল। এখন মানবের নূতনত্ব কাটিয়া গিয়াছে, মানবসংশ্লিষ্ট সমস্ত নূতনত্বের জ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম উৎসব যেন পুষ্পোৎসব, আটবিক রাজ্যের সমস্ত পুষ্পভার বহিয়া আনিয়া আটবিক নগরবাসী আমাদিগের চরণ প্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিল। দ্বিতীয় উৎসব সাজ সজ্জা ও বাহ্যাড়ম্বরের উৎসব, সে উৎসব আমাদিগের জন্য বটে, কিন্তু তথাপি যেন আমাদিগের নহে। তখনও মনে হইত, অতীত কালের পরপারে বসিয়া এখনও মনে হয় সে উৎসব আমাদিগের নহে, সে উৎসব কণিষ্কের। তথাগতের শরীর গর্ভস্তূপের সম্মাননার জন্য উৎসব আরব্ধ হয় নাই, সেই উৎসব কুরুবর্ষ হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে উৎসব বিশাল শকসাম্রাজ্যের অধীশ্বর কণিষ্কের। মহারাজরাজাধিরাজ দেবপুত্র ষাহি কণিষ্ক তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উৎসবের আয়োজন। মেষচর্ম্মপরিহিত পর্ব্বতবাসীর পক্ষে সেরূপ উৎসবের আয়োজন করা অসম্ভব। সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের নিমিত্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়া উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। ইহা আটবিক জাতির উৎসব নহে, পর্ব্বতের সানুদেশবাসী বর্ব্বর জাতির উৎসব নহে, সপ্তদ্বীপবাসী প্রাচীন সভ্যজগতের সমগ্র মানব জাতির সমবেত চেষ্টার ফল। ইহাতে নগরবাসিগণ বন হইতে পত্রপুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনে নাই, পর্ব্বতবাসী বর্ব্বরজাতি সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্যানজাত

অনায়াসলভ্য পুষ্পরাশি ভারে ভারে আনিতে পারে নাই। প্রাচীন আট-বিক নগরবাসিগণের বংশধরেরা দূরে পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া উৎসব দর্শন করিয়াছিল। তাহারা উৎসবক্ষেত্রের যোজনের মধ্যেও আসিতে সাহসী হয় নাই। এমন কি মেষচর্ম্ম পরিহিত যে পথপ্রদর্শক গভীর বন ভেদ করিয়া শকরাজপুরুষকে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাকে পর্য্যন্ত আসিতে দেওয়া হয় নাই। ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে শুনিতাম যে, চীনযুদ্ধের জন্য সমবেত বিশাল বাহিনী লইয়া সম্রাট তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন, পঞ্চলক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে তিনি মথুরা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এই পঞ্চ লক্ষের সহিত সাম্রাজ্যের প্রধান প্রাধান রাজপুরুষ ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিতেছেন, তাঁহাদিগের যাত্রার ব্যবস্থা ও শুশ্রূষার জন্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আয়োজন হইয়াছে। সেই পঞ্চলক্ষের মধ্যে শকদ্বীপ, বাহ্লীক, কপিশা, গান্ধার, উরস, কাশ্মীর, টক্ক, ত্রিগর্ত্ত, উত্থান, মরু, জালন্ধর, মায়াপুর, সুরসেন, মৎস্য, অহিচ্ছত্র, কান্যকুব্জ, বারানসী, করুষ, কীকট, তীরভুক্তি, এমন কি রাঢ় পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশবাসী সৈনিক আছে। এতদ্ব্যতীত সকোণ শিরস্ত্রাণধারী দুর্দ্ধর্ষ শকসৈন্য আছে; কুষাণবংশের অভ্যুত্থানের সহিত দলে দলে আর্য্যবর্ত্তবাসী যবন আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া শকসম্রাটের বেতনভোগী হইয়াছে, চর্ম্ম-পরিহিত শক অশ্বারোহিগণের আক্রমনের তীব্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাশ্মীরের উত্তর সীমান্তবাসী তুষারধবল দরদজাতি শকসম্রাটের বশীভূত হইয়াছে, দলে দলে তাহারাও সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। দরদগণের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু জাতি আর নাই, সারমেয়ের ন্যায় তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবলা, তাহারা ঘ্রাণে অনুভব করিতে পারে, নিকটে শত্রু আছে কিনা; তৃণমণ্ডিত পথে মনুষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ

করিয়া তাহারা বহুদূরে চলিয়া যাইতে পারে। শকসৈন্যের মধ্যে দরদ-জাতি ব্যতীত অপর কোনও জাতি চরের কার্য্য করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে এইরূপ কত কথাই হইত, আমরা শুনিয়া যাইতাম ও প্রথম উৎসবের কথা ভাবিতাম।

পঙ্গপালের ন্যায় শ্রমজীবিগণ আসিয়া বিশাল অরণ্যের বৃক্ষসমূহ নির্ম্মূল করিল। একদিন দূরে উচ্চ মৃৎপিণ্ড দৃষ্ট হইল, কে যেন আমাদিগকে বলিয়া দিল, সেই নগর—যে নগরের অধিবাসী আমাদিগকে পর্ব্বতের সানুদেশের শয্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। যে নগরবাসীরা তথাগতের শরীর স্তূপগর্ভে স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের বহুযত্নের, বহুশ্রমের নগর মৃৎপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে! যে ভীষণ দর্শন বিশালতোরণ পথে আমরা নগরমধ্য হইতে প্রান্তরে আনীত হইয়াছিলাম, সে তোরণের চিহ্ন মাত্র নাই, বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের উপরে কে যেন দুইটি ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিয়াছে, কে যেন আমাদিগকে বলিয়া দিল, উহাই বিশাল তোরণের ধ্বংশাবশেষ। ভুলি নাই, বিশাল আয়োজনের কলরবের মধ্যেও দেখিতে পাইলাম তোরণ হইতে যেন দেবযাত্রা নির্গত হইতেছে; মনে পড়িল, কালভারাবনত দেহ মহাস্থবির, চিরস্মরণীয় পৌরববংশজ সিংহদত্ত, আর ধনভূতি। সিংহদত্তের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে, বর্ষাগমে সিন্ধুনদের প্লাবনে তৃণমুষ্টির ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের দেশীয় ও বিদেশীয় রাজগণ শকজাতির সম্মুখে ভাসিয়া গিয়াছে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমান্তে জলপথাবৃত সমতটেও শকসম্রাটের শক্তি অনু-ভূত হইয়াছে। সুদীর্ঘহস্তে কণিষ্ক রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন। চিরতুষারাবৃত কুরুবর্ষের উত্তর মরু হইতে বাবিরুষ ও মিজ্রাইমের পণ্যবাহী ভৃগুকচ্ছ পর্য্যন্ত রাজার অঙ্গুলী হেলনে কম্পিত হইতেছে। দূরদর্শী পৌরব সত্য বলিয়াছিলেন, সদ্ধর্ম্মেরও দিন ফিরিয়াছে, নতুবা

এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ভেদ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে পথ প্রদর্শক আনিয়া শকরাজপুরুষ তথাগতের শরীর গর্ভের অনুসন্ধানে আসিবে কেন?

যাহারা সম্রাটের অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারা অরণ্যের বৃক্ষরাজি নির্ম্মূল করিয়া সেই কাষ্ঠে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল; সেই দারুনির্ম্মিত নগরের কয়েক খণ্ড পাইয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ যে, প্রাচীনকালে প্রস্তর শিল্প ছিল না। সকলেই চিরক্ষুণ্ণমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে; জানিয়া রাখিয়াছ, এই একমাত্র পথ। পথিপার্শ্বে বনান্তরালে যে উদ্দিষ্ট শত্রু লুক্কায়িত থাকিতে পারে, তাহা ভাব নাই। স্তূপের পার্শ্বে কারুকার্য্যশোভিত কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া স্থির করিয়াছ, পাষাণ-নির্ম্মিত স্তূপের পূর্ব্বে এই স্থানে দারুনির্ম্মিত স্তূপ ছিল, কিন্তু এ কথা কেহ কখনও কোথাও স্বপ্নেও ভাব নাই যে, স্তূপে আগত তীর্থযাত্রীর জন্য দারুনির্ম্মিত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে, তোমাদিগের জন্য অতীতকাল স্তরে স্তরে ধ্বংসাবশেষ সাজাইয়া রাখে নাই, প্রকৃতির আলোড়নে উর্দ্ধের-স্তর নিম্নে গিয়াছে, নিম্নের স্তর উর্দ্ধে আসিয়াছে, মধ্যের স্তরগুলি অপর দেশে চলিয়া গিয়াছে। অতীতের গতি নিরূপণ করিবার জন্য যে বিশ্লেষণ শক্তির আবশ্যক তাহা সকলের থাকে না, তাহা বহুশিক্ষার ফল, গুরুপরম্পরায় শিক্ষার ফল, একদিনে তাহার লাভ হয় না। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ স্তূপের দক্ষিণ-তোরণের সান্নিধ্যে কূপ খননকালে কারু-কার্য্য শোভিত যে কাষ্ঠখণ্ড পাইয়াছিলেন, তাহা প্রস্তর শিল্পের পূর্ব্ব-বর্ত্তী যুগের নহে, তাহা শকাধিকার কালের। ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইওনা। আমি অতীত যুগের সাক্ষী, আমার কথা মানিয়া লইও। আমার যদি সময় নিরূপণ করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি

তোমাদিগের ন্যায় বর্ষ, মাস, দিবস সম্বলিত মান গণনা করিয়া দিতাম। তোমরা প্রত্যক্ষবাদী, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দেখিয়া কোন কথা বিশ্বাস করিতে চাহ না; আমার যদি চক্ষু থাকিত তাহা হইলে আমি বলিতাম, আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তোমাদিগের ভাষায় কি বলিব জানি না, ইন্দ্রিয়-বিহীন পাষাণের কি অনুভব-শক্তি আছে? সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তাহার কণামাত্র তোমরা জানিয়াছ, সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পকলার আভাসমাত্র পাইয়াছ, সেই আভাস প্রত্যক্ষ জানিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিয়া লও। শকাধিকার কালে কণিষ্কের রাজত্বকালে স্তূপসন্নিধানে যে দারুময় নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তোমাদিগের আবিষ্কৃত কাষ্ঠখণ্ডগুলি সেই দারুময় নগরের অংশমাত্র, মানবজাতির সভ্যতার প্রারম্ভের নহে।

নগরনির্ম্মিত হইল। বিশাল শক সাম্রাজ্যে যাহা কিছু দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল রাজপুরুষগণ তাহাই আনিয়া দারুময় নগর শোভিত করিল। প্রাচীন আটবিক নগরবাসীরা কেহ কখনও এত দ্রব্যসম্ভার একত্র হইতে দেখে নাই। তাহারা বহু যত্নে—বহু পরিশ্রমে অশ্মরাশি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অর্থসাহায্যে শরীরগর্ভস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; রাজপুরুষগণের আদেশে আমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান, সেই পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে, রাশি রাশি পাষাণ দারুময় নগরের পথ নির্ম্মাণের জন্য আনীত হইল। পথের আচ্ছাদনের পাষাণে সিন্দুর লেপন করিয়া বর্ব্বর গ্রামবাসিগণ তাহাদিগের সম্মুখে শূকর, কুক্কুট বলি দিয়া থাকে। পথ আলোকিত করিবার জন্য যে দীপস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে; ভূমি-শয্যায় শয়ান বর্ত্তুলোদরগণের বক্ষে দাঁড়াইয়া বনদেবী চম্পক বৃক্ষ

হইতে পুষ্প আহরণ করিতেছেন, দেবীর মস্তকোপরি চম্পক বৃক্ষের শাখায় দোদুল্যমান কাচমণ্ডিত দীপাধার, তোমরা মথুরার স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভে এইরূপ মূর্ত্তি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। দারুময় নগরে প্রতি রাত্রিতে এইরূপ লক্ষ লক্ষ দীপধার ব্যবহৃত হইয়াছিল। কল্পনা করিয়া রাখ কত অর্থব্যয়ে, কত পরিশ্রমে তীর্থযাত্রিগণের আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। আমি এখন যেরূপ ভাবিতেছি, নগর-তোরণের ধ্বংসাবশিষ্ট পাষাণগুলিও বোধ হয় সেইরূপই ভাবিয়াছিল।

সম্রাট আসিতেছেন। উত্তরে উপত্যকার প্রান্তে মেঘের ন্যায় অশ্বারোহীর শ্রেণী দেখা দিয়াছে, মেঘের পর মেঘ উত্তর প্রান্তে দৃষ্ট হইয়াছে, ক্রমে নিকটে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যালোকে প্রতিভাসিত হইয়া তাহাদিগের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ-গুলি দূরে তারকামালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দেখাইতেছে। ইহারা শকজাতীয় অশ্বারোহী। যে অনুন্নতনাসা মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহিগণ নগর ধ্বংস করিয়াছিল, ইহারা সেরূপ নহে। ইহাদিগের বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও অবয়বসমূহ সুগঠিত। সমস্ত অশ্বারোহীই রজতশুভ্র বর্ম্মাচ্ছাদিত। তাহাদিগের এক হস্তে ভল্ল ও অপর হস্তে বল্গা, কটিদেশে ক্ষুদ্র অসি, এতদ্ব্যতীত কাহারও কোন রূপ অস্ত্র ছিল না। শুনিয়াছি, সুদূর প্রতীচ্যে রোমক সৈনিকগণ এইরূপে সজ্জিত হইত। সর্পের ন্যায় অশ্বারোহি-শ্রেণী আসিয়া স্তূপ বেষ্টন করিল। প্রভাত হইতে অনুমান দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত কেবল অশ্বারোহী সৈন্যই আসিয়াছিল। তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রের বা বেশভূষার কোনই পার্থক্য ছিল না। অশ্বারোহিশ্রেণীর পর

বন্যার স্রোতের ন্যায় পদাতিক সৈন্য আসিতে আরম্ভ করিল। নানা দেশ হইতে নানারূপ পরিচ্ছদধারী সৈনিক, পদাতিক সৈন্যের মধ্যে দৃষ্ট হইল,—স্বল্পপরিচ্ছদপ্রিয় মগধবাসী, উষ্ণীষধারী কান্যকুব্জবাসী, নানাবর্ণেরঞ্জিত পরিচ্ছদপ্রিয় সৌরসেন, উষ্ণীষে লৌহচক্রধারী জালন্ধরবাসী, দীর্ঘকায় বস্ত্রমণ্ডিত টক্ক, মলিনবেশধারী শ্বেতবর্ণ কাশ্মীর ও গান্ধারবাসী ও অল্প সংখ্যক চর্ম্মাবৃত শক সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হইল। যতক্ষণ সূর্য্যালোক ছিল ততক্ষণ পদাতিক সৈন্যই দেখিতে পাইয়াছিলাম, সন্ধ্যাসমাগমে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ সহস্র সহস্র উল্কার আলোকে দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন দূর হইতে শকটচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুত হইল, বহুসংখ্যক দ্বিচক্র ও চতুশ্চক্র অশ্ববাহিত রথ আসিতে আরম্ভ হইল, শক সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ এই সকল রথারোহণে আসিলেন; সেই শব্দই শ্রুত হইল। শ্বেতবর্ণ ষোড়শঅশ্বযোজিতরথে কান্যকুব্জের মহাক্ষত্রপ বনস্পর আসিলেন; তাঁহার সহিত শতাধিক রথে তাঁহার পরিজনমণ্ডলী আসিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উষ্ট্রচতুষ্টয়যোজিত রথে মগধ-বিজয়ী মহাক্ষত্রপ খরপল্লান আসিলেন। অশ্বারোহণে স্ত্রীমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া তক্ষশিলার মহাক্ষত্রপ মহাদণ্ডনায়ক লল্ল আসিলেন, সমবেত জনসঙ্ঘ বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে কোমলাঙ্গী কাশ্মীর ও গান্ধার ললনাগণের নিপুণ অশ্বচালনা দেখিতে লাগিল; কারণ ইহার পূর্ব্বে মহা-কোশলে অশ্বপৃষ্ঠে স্ত্রীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় নাই। হস্তিপৃষ্ঠস্থাপিত দারুনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট কপিশার মহাক্ষত্রপ বেস্পাশি আসিলেন, তাঁহার সহিত মহাকায় গজসমূহের পৃষ্ঠে স্থাপিত বৃহৎ সিংহাসনে মহল্লিকা পরিবৃত কপিশা ও বাহ্লিক-মহিলামণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। এইরূপে রজনী দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে সমুপস্থিত অমাত্য ও সভাসদ্‌মণ্ডলী উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে বোধ হইল, যেন দূরে পর্ব্বতের সানুদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; ক্ষণেকের মধ্যেই বোধ হইল, প্রজ্বলিত অগ্নি দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দুই দণ্ড পরে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ও কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে, "সম্রাট আসিতেছেন"—কেবল এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। অগ্নি নিকটবর্ত্তী হইলে দৃষ্ট হইল, পাষাণাচ্ছাদিত পথের পার্শ্বে উল্কা হস্তে সহস্রাধিক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাদিগের বাহন ক্ষীণকায় দীর্ঘাকার সিন্ধুদেশীয় অশ্ব, পরিচ্ছদ শ্বেতবর্ণ ও দক্ষিণ হস্তে সপ্তহস্ত পরিমিত উল্কা, দ্বিসহস্র উল্কার আলোকে যে পথ আলোকিত হইতেছিল সেই পথে দুইজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, একজন মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র কণিষ্ক ও অপর জন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ হুবিষ্ক। সম্রাটের আকার দীর্ঘ, মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত, নাসিকায় ও দক্ষিণ গণ্ডে দীর্ঘ আঘাত চিহ্ন, দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার জীবনের অধিকাংশই যুদ্ধযাত্রায় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার কটিদেশে সার্দ্ধদ্বিহস্ত পরিমিত খড়্গ। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুবিষ্ক—দীর্ঘকায়, কোমলাঙ্গ, শ্মশ্রুবিরহিত, নবীন যুবক; আজীবন সুখানুসন্ধানের চিহ্ন যেন তাঁহার মুখে অঙ্কিত রহিয়াছে। অশ্বারোহি-শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে বিংশতি বা ততোঽধিক পরিচারক দ্রুতগামী অশ্বারোহণে আসিতেছিল।

সম্রাট আসিতেছেন, শুনিয়া কাষ্ঠময় নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই পাষাণাচ্ছাদিত পথাভিমুখে ধাবিত হইল। জনতার পেষণে

বনস্পরের রত্নখচিত উষ্ণীষ ধূলিতে লুণ্ঠিত হইল ; দণ্ডনায়ক লল্লের শিরস্ত্রাণ পাদপেষণে চূর্ণ হইয়া গেল। বেস্পশির মহাদেবী জনতার তাড়নায় স্তূপের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আর সম্রাটের আগমন দর্শন ঘটিল না। অত্যন্ত পীড়িত হইয়া খরপল্লান খড়্গে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখেন, তাহা নিষ্কাশনের উপায় নাই। প্রধান্ অমাত্য, সভাসদ্ ও পরিচারক, দৌবারিক ও ভিক্ষু, অশ্বারোহী ও পদাতিক, স্ত্রী ও পুরুষ সেই বিশাল জনসঙ্ঘে একত্র মিলিত হইয়া গেল, পদমর্য্যাদা অন্তর্হিত হইল। সম্রাট উপস্থিত হইলে তাঁহার বাহিনীর জন্য পথ মুক্ত হইল বটে ; কিন্তু জয়ধ্বনি ব্যতীত তাঁহার আর কোনও অভ্যর্থনা হইল না। তিনি আসিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত নগর হইতে দূরে পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। জনসঙ্ঘ যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্বদিকের অন্ধকার দূর হইতে লাগিল, শিশিরসিক্ত প্রভাতে উৎসবের দিনে দৌবারিক ও প্রহরী ব্যতীত সমস্ত নগর সুষুপ্তিমগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হইল। প্রভাতে উৎসব আরব্ধ হইল। সাম্রাজ্যের উৎসব আটবিক নগরের উৎসবের ন্যায় নহে, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলতার: লেশমাত্র দেখা যায় নাই। ধীরে ধীরে কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী স্তূপবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সমাগত হইলেন। প্রাচীন স্তূপ নবসংস্কারের জন্য নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল। মহাস্থবির পার্শ্ব স্তূপের আর কোনও সাজসজ্জার আবশ্যক বোধ করেন নাই ; তবে রাজপুরুষগণ বেষ্টনীর বাহিরে ও পরিক্রমণের পথে যথাযোগ্য সজ্জা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই উৎসব আরব্ধ হইল। রাজস্কন্ধাবার হইতে বেষ্টনীর পূর্ব্ব-তোরণ পর্য্যন্ত পাষাণ নির্ম্মিত পথ বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল, সমান্তরালে প্রোথিত হৈমদণ্ডশ্রেণীর উপরে মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য পট্টবাস

স্থাপিত হইল, বিবিধ সুদৃশ্য বর্ণরঞ্জিত কৌষেয় বস্ত্রে সুবর্ণ দণ্ডগুলি মণ্ডিত হইল, পথের আচ্ছাদনে বহু দূরদেশ হইতে আনীত বহুযত্নে সংগৃহীত পুষ্পরাশি বিক্ষিপ্ত হইল, পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গন্ধবারির কৃত্রিম প্রস্রবণ নির্ম্মিত হইল। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরে পথের উভয় পার্শ্বে একশ্রেণী পদাতিক ও একশ্রেণী অশ্বারোহী সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। ইহারা শোভাবর্দ্ধন করিল বটে, কিন্তু ভীত দর্শকগণের দৃষ্টি ও গতি উভয়ই রোধ করিল। অল্পক্ষণ পরে নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত ভিক্ষুগণ স্তূপাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহারা বহু কষ্টে যোদ্ধৃগণের পংক্তি চতুষ্টয় ভেদ করিয়া,ভীতিচকিত পাদক্ষেপে, মহার্ঘ বস্ত্রদলন হেতু স্খলিত চরণে, বহুকষ্টে বেষ্টনীর তোরণ-দ্বার প্রাপ্ত হইলেন। সৈনিকগণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, কাষায় বা গৈরিকধারী সম্প্রদায় যেন তাহাদিগের অনুগ্রহের পাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার কোনই কারণ নাই। তখন মনে হইল যে, আর্য্যাবর্ত্তে নূতন বিপ্লবে সঙ্ঘের ও সদ্ধর্ম্মের স্থান-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, পাশব বলে বলীয়ান্ শকজাতি সদ্ধর্ম্মের ছায়া মাত্র স্পর্শ করিয়াছে বটে, কিন্তু সদ্ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। সম্রাট ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই জন্যই সাধারণে সঙ্ঘের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সম্মান দেখাইয়া থাকে; তদতিরিক্ত নহে। সম্রাট বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, বাবিরুষ বা ইরানীয় ধর্ম্মের প্রতিও তদনুরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং সৈনিকগণের সদ্ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইবার কোন কারণই ছিল না। কিয়ৎকাল পরে সম্রাট স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের মহাক্ষত্রপগণ পরিবৃত হইয়া স্তূপের সান্নিধ্যে আসিলেন।

তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে পরিচারকগণ আতপত্র ও ব্যজনী লইয়া আসিতেছিল, পশ্চাতে মহারাজ হুবিষ্ক ও শকজাতীয় ক্ষত্রপগণ আসিতেছিলেন। তিনি প্রথম তোরণে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ ও দ্বিতীয় তোরণে উপস্থিত হইলে মহাস্থবিরগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং মহাস্থবির পার্শ্বকে অগ্রণী করিয়া অপরাপর সঙ্ঘস্থবিরগণ তাঁহাকে স্তূপ অর্চ্চন ও প্রদক্ষিণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুবর্ণগৌরকান্তি নবীন যুবক হুবিষ্ককে পার্শ্বে লইয়া, সম্রাট ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুগমন করিয়া স্তূপ প্রদক্ষিণ করিলেন ও অর্চ্চনার জন্য পূর্ব্ব তোরণের সম্মুখীন হইলেন। ফিরিবার সময় সম্রাটের কটিবদ্ধ অসি অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার স্তূপগাত্রে লাগিয়া গভীর শব্দ উৎপাদন করিল। সম্রাট শব্দ শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন ও অর্চ্চনার সময় অন্যমনস্ক ছিলেন। অর্চ্চনান্তে কোষনিবদ্ধ অসি কটিবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া সম্রাট ধীরে ধীরে স্তূপগাত্রে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইয়া প্রধান অমাত্যগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আঘাত করিবার পর. বিশাল প্রস্তরখণ্ডে খড়্গের অগ্রভাগ লাগিয়া ধাতু পাত্রদ্বয়ে সংঘর্ষণের ন্যায় শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া সম্রাট কণিষ্ক ও মহাস্থবির পার্শ্ব চমকিত হইলেন। সম্রাটের আদেশে দীর্ঘকায় কপিশাবাসী সৈনিক চতুষ্টয় স্কন্ধ প্রয়োগে গুরুভার পাষাণ স্থানচ্যুত করিয়া স্তূপের পার্শ্বে প্রবিষ্ট করাইল। শতাব্দীদ্বয় পরিমিত কালের পর গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সম্রাট আসিয়াছেন, যক্ষগণের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে; কনিষ্কের স্পর্শমাত্রে গর্ভগৃহের লুক্কায়িত দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে এইরূপ শব্দই ঘোষিত হইতে লাগিল। পার্শ্ব শরীরনিধানের অনুসন্ধানে

গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন কিন্তু সম্রাট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতিমধ্যে গর্ভগৃহের দ্বারের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল ও কয়েকখণ্ড প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গর্ভগৃহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল; পরে বর্ম্মাবৃত পদাতিকগণ প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড লইয়া গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল ও সমস্ত গৃহটি পর্য্যটন করিয়া আসিল। মহাস্থবিরগণের পশ্চাতে সম্রাট ও হুবিষ্ক গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাষাণনির্ম্মিত আধারের অর্চ্চনা করিলেন। কম্পিত হস্তে বর্ষীয়ান স্থবিরগণ গুরুভার আধার উন্মোচন করিয়া প্রথমে সুবর্ণনির্ম্মিত ও পরে তন্মধ্যস্থ স্ফাটিক শরীরনিধান উত্তোলন করিলেন। সেই সময় কে যেন আসিয়া শত শত যুদ্ধের রক্তপিপাসু সম্রাটের জানুদ্বয় ভগ্ন করিল, স্ফাটিকাধার উন্মুক্ত হইবামাত্র ভীষণদর্শন নিষ্ঠুর শকসম্রাট ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইলেন। কে জানে সুদূর অতীতে শাক্যরাজকুমারের কি প্রতিভা ছিল, কি মোহিনী শক্তি ছিল, যাহার বলে নির্ম্মম—কঠোর নরঘাতকের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। সম্রাটের সহিত গর্ভগৃহস্থ ব্যক্তিমাত্রেই শরীরনিধানের সম্মুখে নতশীর্ষ হইলেন; সংক্রামতা ক্রমে গর্ভগৃহের বহির্দ্দেশে ও পরে বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে ব্যাপ্ত হইল; আনন্দে ও গর্ব্বে পার্শ্বের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি তখনও ধনভূতির প্রদত্ত স্ফাটিকাধার হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন বুঝিলাম, শরীরনিধান রক্ষাকালে বর্ষীয়ান মহাস্থবির কি বলিয়াছিলেন। শকপ্লাবন আসিয়াছে, কপিশা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ শকজাতির হস্তগত হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা প্রায় ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহারই ফলে আর্য্যাবর্ত্তের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। সত্য সত্যই প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মরুবাসী বর্ব্বর শকজাতির

মহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। শকজাতির শকত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। বিশাল শকসাম্রাজ্যের অধীশ্বর সেই জন্যই অঙ্গুলি পরিমিত স্ফাটিকাধারে নিবদ্ধ অস্থিখণ্ডের সম্মুখে নতশির হইয়াছেন। বর্ষীয়ান মহাস্থবিরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, শকজাতি ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতির দিন আসিয়াছে, নবীন গৌরব মৌর্য্যাধিকার কালের অতীত গৌরবের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। শরীরনিধান হস্তে লইয়া পার্শ্ব ও অপরাপর সকলে গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলেন। সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও তাঁহাদিগের মহিলাগণ অস্থিখণ্ড স্পর্শ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সম্রাটের আদেশে স্ফাটিক, সুবর্ণ ও পাষাণ নির্ম্মিত আধার যথাস্থানে স্থাপিত হইল, সশব্দে গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল; যাহারা দ্বার রুদ্ধ করিল তাহারা জানিত না যে, তাহারা চিরকালের নিমিত্ত তথাগতের শরীরনিধান মানবের দৃষ্টির বহির্ভূত করিতেছে। সম্রাটের যাত্রা সফল হইয়াছে, গর্ভগৃহের দ্বারের সম্মুখে গান্ধার হইতে আনীত নবোৎকর্ষ প্রাপ্ত যবনশিল্পের নিদর্শন, কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইল, যেন গর্ভগৃহের দ্বার আর কেহ স্পর্শ না করিতে পারে। ইহার পূর্ব্বে কখনও মূর্ত্তি দেখি নাই। আমাদিগের গাত্রে চিত্র আছে বটে কিন্তু মূর্ত্তি নাই। সদ্ধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা এই সময়ে আরব্ধ হয়। ইহার পূর্ব্বে চিত্রে চরণদ্বয় তথাগতের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিত। সম্রাটের আদেশে স্থাপিত মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন; তখন ভাবিতাম ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই, হইতে পারে না, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মূর্ত্তিনির্ম্মাণের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। যবনশিল্পী কর্ত্তৃক শিক্ষিত ভারতবাসী মূর্ত্তি-তক্ষণে অপেক্ষাকৃত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। সে সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইত গান্ধারের মূর্ত্তিগুলি

যবনের মূর্ত্তি ও মধ্য দেশের মূর্ত্তিগুলি আর্য্যাবর্ত্তবাসীর মূর্ত্তি। সন্ধ্যা সমাগমে পূর্ব্বের ন্যায় উল্কাবাহী অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া সম্রাট যুদ্ধযাত্রা করিলেন; দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের ন্যায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত শিবির ভাঙ্গিয়া গেল। অরণি সংগ্রহ করিতে আসিয়া পার্ব্বত্য উপত্যকা-বাসিগণ মহাবনের কাষ্ঠ মহাবনে লইয়া গেল। আমাদিগের পূর্ব্ব সহচর ভিক্ষুগণ অতি সন্তর্পণে আসিয়া ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম অধিকার করিলেন। কণিষ্কের বিশালবাহিনী সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় চীনপ্রান্ত আক্রমণ করিল, শিলাসঙ্কুলতটবিক্ষিপ্ত উর্ম্মিরাশির ন্যায় পরাজিত সৈন্য কাশ্মীরে আশ্রয় লাভ করিল। কুরুবর্ষ চীনসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, পারদগণ কপিশা অধিকার করিল, বিংশতিবর্ষব্যাপী চেষ্টায় বর্ষীয়ান সম্রাট-সৈন্য মরুপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন চীনসৈন্যের অধিনায়ক পাঞ্চাও দেহত্যাগ করিয়াছেন, জিঘাংসাবৃত্তি সফলা হইল, কিন্তু কণিষ্ক আর আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া আইসেন নাই। বাহ্লীকে তাঁহার সমাধি বহু দিন পর্য্যন্ত হূণগণের অর্চ্চনার স্থান ছিল। ক্ষুদ্র সঙ্ঘের ভিক্ষুগণের কথোপ-কথনে যাহা জানিয়াছি তাহাই বলিলাম।

---

[৮]

কণিষ্ক চলিয়া যাইবার পরে কিছু কাল নানাদিগ্দেশ হইতে শরীর গর্ভস্তূপ-দর্শন-মানসে বহুযাত্রী আমাদিগের নিকটে আসিত। শুনিয়াছি, কণিষ্কের দ্বিতীয়পুত্র হুবিষ্কের রাজত্বকালে সদ্ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধিকার আর্য্যাবর্ত্তে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে স্তূপবেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বে বিত্তশালী তীর্থযাত্রীগণ কর্তৃক অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তোমরা প্রাচীন স্তূপের বহির্দ্দেশে এখনও যে সমস্ত মূর্ত্তির ভগ্নাংশ দেখিতে পাও, তাহা এই ক্ষুদ্র মন্দির গুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুবিষ্কের মৃত্যুর পর পুনরায় সদ্ধর্ম্মের অবনতি আরব্ধ হইল; কারণ, নূতন সম্রাট বাসুদেব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরেই আর্য্যাবর্ত্তের সমুদায় বিহারে ও সঙ্ঘারামে বিলাপধ্বনি শ্রুত হইল; কোনও স্থানে বৃত্তির অভাবে, কোনও স্থানে বা রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে ও ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলাচরণে সঙ্ঘারামগুলি ভিক্ষুশূন্য হইয়া উঠিল। বাসুদেবের অব্যবহিত পরে যে সকল কুষাণবংশীয় রাজা সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহাদের অধিকার পঞ্চনদ ব্যতীত অপর কোনও দেশে বিস্তৃত হয় নাই। ক্রমে বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। প্রকৃত কুষাণবংশীয়দিগের হস্তে পঞ্চনদ ব্যতীত অপর কোনও দেশের অধিকার রহিল না। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল; এবং পৃষ্ঠপোষণের অভাবে সদ্ধর্ম্মের তদনুরূপ ক্ষতি হইতেছিল। ক্রমে স্তূপের সন্নিহিত

ক্ষুদ্র সঙ্ঘারামে স্থবিরগণের দেহাবসানের পর নূতন ভিক্ষুর অভাব ঘটিতে লাগিল ও ধীরে ধীরে সঙ্ঘারামবাসিদিগের সংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল। যে কয়েকজন অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহাদেরই মুখে শুনিতাম যে, পাটলিপুত্রে নূতন সাম্রাজ্যের বীজ উপ্ত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নূতন রাজবংশ স্পষ্টভাবে সদ্ধর্ম্মের বিরোধী না হইলেও তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগী নহেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত লিচ্ছবিকন্যা কুমারদেবীর পরিণয় সম্পন্ন হইবার পর হইতেই নূতন রাজ্যের আকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; একে একে ক্ষুদ্র শকরাজ্যগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল; পশ্চিমসাগরতীরে সৌরাষ্ট্রমাত্র আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় স্থল হইয়া রহিল। ক্রমে তীর্থযাত্রিগণেরও সংখ্যার অত্যন্ত হ্রাস হইল। পাটলিপুত্রে লিচ্ছবি-দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্ত যখন আসমুদ্র-ক্ষিতিজয়ের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; যে কয়েকজন ভিক্ষু ভিক্ষোপজীবিকা অবলম্বন করিয়া বনমধ্যস্থ সঙ্ঘারামে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থানও অসম্ভব-প্রায় হইয়া উঠিল। সমুদ্রগুপ্তের পর চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আনর্ত্তে ও সৌরাষ্ট্রে শকাধিকার লোপ করিলেন, ভারতে শকাধিকারের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল, কামরূপ হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার পদানত হইল এবং দক্ষিণে নীলগিরি পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথবাসী রাজগণ তাঁহার চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিলেন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর উত্তরাপথে এরূপ বিশাল সাম্রাজ্য আর দেখা যায় নাই। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে তথাগতের ধর্ম্ম দিন দিন ক্ষীণতর হইতেছিল।

বহুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে বিজাতীয় শত্রু প্রবেশলাভ করে নাই। সুদূর অতীতে শকজাতির আক্রমণ সকলে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। শকগণও আর্য্যাবর্ত্তের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও ভাষা অবলম্বন করিয়া, আর্য্যজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। কেহই ভাবে নাই যে, প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীন আর্য্যাবর্ত্ত কোনও বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। মরুপ্রান্তে তুষারময় উত্তরে বর্ব্বরজাতির অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ হূণ অশ্বারোহী মরুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া বাহ্লীক ও কপিশা আক্রমণ করিল, ধূলিমুষ্টির ন্যায় সেই প্রবল ঝটিকার সম্মুখে গান্ধারের কুষাণরাজ্য উড়িয়া গেল, গান্ধারের ও উদ্যানে শকজাতীয় সামন্তরাজগণ হূণ আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টাও করিল না। এই সময়ে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইল। প্রৌঢ় কুমারগুপ্তের উপরে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। মগধে যখন অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তখন হূণগণ ধীরে ধীরে, পঞ্চনদ, কাশ্মীর, দরদ ও খসদেশ শ্মশানে পরিণত করিতেছে। হূণগণের নাম তোমরা অতি অল্পদিন শুনিয়াছ, কিন্তু কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে হূণগণের নাম করিলে ভীতি-বিহ্বলা-গর্ভিণীর গর্ভপাত হইত, স্কন্দগুপ্তের শাসন-কালে তাহাদিগের নাম শুনিলে দেশবিখ্যাত বীরগণ প্রহরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হইতেন। খর্ব্বাকার, স্থূলদেহ, গুম্ফশ্মশ্রু-বিহীন, পেচকের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট পশুচর্ম্মাচ্ছাদিত হূণগণকে দেখিলে মনে অত্যন্ত ভয় হইত। সে সময়ে হূণগণের নাম শুনিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় জগতের সকল জাতিকেই শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি, হূণদর্শনে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের জনৈক বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক বলিয়াছিলেন যে, তাহারা তাতারবাসী নহে—নরকবাসী।

হূণগণ যখন গুপ্তসাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিল, তখন কুমার-গুপ্ত পাটলিপুত্রের প্রাসাদে সুষুপ্তিমগ্ন; কুমার স্কন্দগুপ্ত মথুরার শাসনকর্ত্তা। স্কন্দগুপ্ত সিন্ধুতীরে যথাসাধ্য হূণগণের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; চন্দ্রগুপ্তের সুশিক্ষিত সৈন্যবৃন্দও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। ইরাবতী, বিতস্তা ও শতদ্রুতীরে উত্তরা-পথবাসী সহস্র সহস্র সৈনিক স্বদেশরক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, কিন্তু বাত্যাতাড়িত সাগরোর্ম্মিরাশির ন্যায় হূণ অশ্বারোহিগণ স্কন্দ-গুপ্তের সৈন্যবল ভাসাইয়া লইয়া গেল। শতদ্রুপারে আসিয়া কুমার বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইলেন। বিতস্তাতীর হইতে যে দূত সাহায্য প্রার্থনার জন্য মগধে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া শতদ্রু-তীরের স্কন্ধাবারে যুবরাজকে বিষমসংবাদ জ্ঞাপন করিল,—বৃদ্ধ কুমারগুপ্ত তরুণীর রূপজমোহে আবদ্ধ হইয়াছেন, পঞ্চাশৎবর্ষীয় বৃদ্ধ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, এবং স্কন্দগুপ্তের মাতা ক্রোধে ও ক্ষোভে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দারুণ সংবাদ শুনিয়া স্কন্দগুপ্ত স্তম্ভিত হইলেন, অসম দ্বন্দ্বে তাঁহার বিলক্ষণ বলক্ষয় হইয়াছিল। তিনি মগধ হইতে বহু সৈন্যের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সম্রাট্ তখন নূতন মহিষীর আবাসে; মাসাধিক কাল কেহ তাঁহার দর্শন পায় নাই। হতাশ হইয়া স্কন্দগুপ্ত মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও তথায় তদীয় খুল্লতাত মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্তের প্রেরিত দূতমুখে সংবাদ পাইলেন যে, গোবিন্দগুপ্ত স্বয়ং বলসংগ্রহ করিতেছেন; তিনি সম্রাটের আদেশের জন্য অপেক্ষা করেন নাই; কারণ, তখনও পর্য্যন্ত কেহই সম্রাটের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হয় নাই। সুখের বিষয় শতদ্রুতীর হইতে হূণগণ

উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, সুতরং স্কন্দগুপ্ত মথুরায় আসিয়া নগর রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দগুপ্ত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মথুরায় আসিয়া স্কন্দগুপ্তের সহিত মিলিত হইলেন। খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র একত্র হইয়া হূণগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নব-পরিণীতা বালিকা মহিষীকে লইয়া কুমারগুপ্ত পাটলিপুত্র হইতে মহোদয়ে আসিলেন। পাটলিপুত্রের প্রাসাদবাসিগণের বাক্যযন্ত্রণা তাঁহার মহিষীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; গঙ্গাতীরবর্ত্তী কান্যকুব্জের প্রাচীন প্রাসাদে আসিয়া বর্ষীয়ান সম্রাট শান্তি লাভ করিলেন। হূণগণ ধীরে ধীরে মথুরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্কন্দগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্তকে সাহায্য করিবার জন্য আর কেহই চেষ্টা করিল না। শকপ্লাবনের ন্যায় হূণপ্লাবন আসিয়া প্রাচীন সৌরসেন রাজ্য ভাসাইয়া লইয়া গেল, নানাবিধ প্রাচীন কারুকার্য্যশোভিত রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত মথুরার নগর-প্রাকার হূণগণের আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ হইল না। গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত সন্তরণে যমুনা পার হইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। ভিখারীর ন্যায় চীর পরিধান করিয়া কুমার ও মহারাজপুত্র, মহোদয়নগরীর তোরণে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিকগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না বা সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল না। তাঁহারা নগ্নপদে সুদীর্ঘ রাজবর্ত্মগুলি অতিক্রম করিয়া জাহ্নবীতীরে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সামান্য ভিক্ষুক জ্ঞানে প্রতীহারিগণ তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিতেছিল; রোষে গোবিন্দগুপ্ত অসিমুক্ত করিলেন। সমুদ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত তরবারি দেখিবামাত্র প্রতীহারগণ নতশির হইল, তাহারা সিপ্রা ও

ভাগীরথীতীরে গোবিন্দগুপ্তের ক্ষিপ্রহস্তে সেই অসিচালনা দেখিয়াছিল। কোষমুক্ত অসিহস্তে নিবারণোন্মুখ মহল্লিকাবর্গপরিবৃত হইয়া মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় উভয়ে সম্রাটের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, বর্ষীয়ান্ সম্রাট্ মহিষীর জন্য মাল্য রচনায় নিযুক্ত আছেন। পুত্রকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া বৃদ্ধ অতি লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দগুপ্তের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। উন্মত্তের জ্ঞানোদয় হইল না; বৃদ্ধ সম্রাট্ অপরাধ স্বীকার করিয়া কুমার ও মহারাজপুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তরুণী মহিষীর ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া তাহাও করিতে পারিলেন না। অনেক অনুরোধের পর স্কন্দগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত মহিষীসমভিব্যাহারে বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে মন্ত্রণাগৃহে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন। মহিষীর অনুজ্ঞাক্রমে রাজশ্যালক হূণযুদ্ধে সেনাপতি নির্দ্দিষ্ট হইলেন। ইহার অতি অল্পদিন পরেই নিশীথকালে অল্পসংখ্যক হূণ অশ্বারোহী নগর আক্রমণ করিল, হূণনাম শ্রবণমাত্র বৃদ্ধ সম্রাট্ মহিষী ও শিশুপুত্রকে লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে নগর ত্যাগ করিলেন। মুষ্টিমেয় হূণ অশ্বারোহী রাত্রিকালে প্রাচীন মহোদয় নগরীকে শ্রীহীন করিয়া গেল, স্তম্ভিত নগরবাসিগণ আত্মরক্ষা করিতেও সমর্থ হইল না।

শরৎকালে একদিন প্রত্যূষে সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ পরিক্রমণের পথ করিতেছেন, এমন সময়ে কনিষ্কনির্ম্মিত পাষাণাচ্ছাদিত পথে বহুরথচক্রের নির্ঘোষ শ্রুত হইল। অর্থলোলুপ ভিক্ষুগণ ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন আঢ্য শ্রেষ্ঠী তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন। কিন্তু সমাগত ব্যক্তিগণকে দেখিবামাত্র তাঁহাদিগের অর্থলালসা দূর হইয়া গেল, তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন যে,

অসংখ্য রাজপুরুষসমাবৃত হইয়া সিন্ধুদেশীয় অশ্বচতুষ্টয়বাহিত রথে আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর কুমারগুপ্ত মহিষী ও পুত্র সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে স্তূপাভিমুখে আসিতেছেন। সৈনিকগণ শীঘ্রই ভিক্ষুগণকে স্তূপসন্নিধান হইতে দূর করিয়া দিল, সম্রাট্ পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীন সঙ্ঘারামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে বহু বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল। তখন সাম্রাজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হূণগণ প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে পাটলিপুত্রে গোবিন্দগুপ্ত ও দক্ষিণে সৌরাষ্ট্রে স্কন্দগুপ্ত বহু কষ্টে সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধ রাজমহিষীর অনুরোধে যুদ্ধবিগ্রহ হইতে দূরে থাকিবার জন্য বিন্ধ্যাটবীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

একদিন বনপথ অতিক্রম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ পাষাণের উপর উপবেশন করিয়া মহিষীর কেশদামের পরিচর্য্যা করিতেছেন ও স্তূপবেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক পুরগুপ্ত প্রাচীন জাতকের চিত্রগুলির প্রতি শরসন্ধান করিতেছে। দক্ষিণ-তোরণের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দগুপ্ত বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী আপনাকে ভ্রমক্রমে পালন করিয়াছিলেন। যে স্তন্যপানে আমার দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই স্তন্যপানে আপনারও দেহ পুষ্ট হইয়াছে; সে কথা স্মরণ করিয়া আপনার কি লজ্জাবোধ হইতেছে না? যাঁহার বাহুবলে একদিন বাহ্লীক হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের পদানত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির বাহুবল অদ্য রমণী আর্দ্র কুন্তল শুষ্ক করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও

আমাকে দেখিতে হইল? যাঁহার বাহুবলে শকগণ সৌরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য মরুমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তিকে ভগবান্ কি পাপের জন্য বৃদ্ধবয়সে রমণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন? উঠ, মহারাজ, ভূমিশয্যা পরিত্যাগ কর। চল, উভয় ভ্রাতায় পিতামহ-প্রদত্ত দিগ্বিজয়ী তরবারি গ্রহণ করিয়া বিজাতীয় হূণগণকে সিন্ধুর পরপরে রাখিয়া আসি। মহারাজ, পাটলিপুত্র, মহোদয়, মথুরা, অবন্তী ও জালন্ধর পরিত্যাগ করিয়া কেন বিন্ধ্য পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে? শৈশবের আবাসভূমি পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ, মথুরা, অবন্তী ও সুন্দর জালন্ধর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে তুমি কি কষ্ট বোধ কর নাই? উঠ, প্রহরণ গ্রহণ কর, তরুণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া জড়ের ন্যায় বহুকাল বাস করিয়াছ; তোমার জড়তা দূর করিবার সময় আসিয়াছে।" নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বর্ষীয়ান্ সম্রাট মহিষীর কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছের প্রান্তে উপবিষ্ট রহিলেন। মহিষী রাজপুত্রের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন; রোষে গোবিন্দগুপ্তের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ও স্কন্দগুপ্তের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। উভয়ে ধীরে ধীরে স্তূপবেষ্টনীর বহির্দ্দেশে গমন করিলেন।

বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত কয়েকজন বৃদ্ধ দণ্ডায়মান ছিলেন। গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তকে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইলেন; তিনি বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের একমাত্র মন্ত্রী যুবরাজভট্টারকপাদীয়কুমারামাত্যাধিকরণ দামোদর শর্ম্মা। তাঁহাদের শুষ্কমুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়াই বহুদর্শী মন্ত্রী তাঁহাদিগের সাধনার ফল অবগত হইলেন। খুল্লতাতের

বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বাক্য নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, অধঃপতনের সময় হইলেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ইহা নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; তবে তিনি স্বয়ং রাজসদনে উপস্থিত হইয়া রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিবেন। প্রধান সেনাপতি মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্ত ও প্রধান বিচারপতি মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত মন্ত্রীর বাক্য সমর্থন করিলেন। পরক্ষণেই পলিতকেশ সচিব তোরণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুমার-গুপ্ত তখনও সেই ভাবে বসিয়া আছেন, মহিষী নিদ্রিতা; বালক পুরগুপ্ত আলম্বনের উপরে আরোহণের চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধ সচিব ও বৃদ্ধ সম্রাটে প্রায় একদণ্ডের অধিক কাল কথোপকথন হইল। বহু বাক্য ব্যয় করিয়া রাজনীতিকুশল দামোদরশর্ম্মা বৃদ্ধ সম্রাট্কে কুমার স্কন্দগুপ্তের প্রতিনিধিত্বে সম্মত করাইলেন, কিন্তু সপত্নী-পুত্রের নাম শ্রবণ মাত্র মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বর্ষীয়ান্ সম্রাট্ সভয়ে বলিয়া উঠিলেন যে, গুরুতর রাজকার্য্যে মহাদেবীর পরামর্শ আবশ্যক। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রোষে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। মহাদেবীর আদেশ হইল, ত্রয়োদশবর্ষীয় কুমার পুরগুপ্ত হূণযুদ্ধে সম্রাট্ কুমার-গুপ্তের প্রতিনিধিস্বরূপ মহাবলাধিকৃতের সঙ্গী হইবে। দামোদর শর্ম্মা অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইলেন। শুষ্ককণ্ঠে যুবরাজপাদ দামোদর শর্ম্মা যখন সর্ব্বসমক্ষে মহাদেবীর আদেশ প্রচার করিলেন, তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষ দশা আগতপ্রায়। বিষণ্ণ বদনে সকলে স্তূপসন্নিধান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ও

এক প্রহর সময়ের মধ্যেই গোবিন্দ গুপ্ত অশ্বারোহণে পাটলিপুত্রাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। প্রভাতে সকলে সবিস্ময়ে শুনিল যে, রাত্রিকালে স্কন্দগুপ্ত অজ্ঞাতসারে স্কন্ধাবার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন হইতেই বিচক্ষণ সেনানীগণের মুখ ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় গম্ভীর হইয়া উঠিল।

---

[৯]

বলীবর্দ্দদ্বয়বাহিত রথে বৃদ্ধ সম্রাট্ স্তূপসন্নিধান হইতে পাটলিপুত্রে নীত হইতেছেন। স্কন্ধাবার অন্তর্হিত হইয়াছে, কয়েকজন অশ্বারোহ ধীরে ধীরে শকটের পশ্চাতে চলিতেছে। মহিষী জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় বৃদ্ধ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে রাজদণ্ড অধিকার করিতে গিয়াছেন। কনিষ্কনির্ম্মিত পাষাণাচ্ছাদিত পথে ঘর্ঘর শব্দে বন মুখরিত করিয়া ধীর মন্থর গতিতে সম্রাটের রথ চলিয়াছে। তখন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পাটলিপুত্রে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে; আর কান্যকুব্জে, প্রতিষ্ঠানে ও সুদূর মহাসমুদ্রের তীরবর্ত্তী আনর্ত্তে অসহায় নরনারীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে। শতবর্ষ পরেও সে কথা শ্রবণ করিয়া মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়ামত্ত শিশু নিশ্চল হইত। হূণপ্লাবন ত্রিবেণী হইতে সুদূর প্রতীচ্যে রোমক নগরীর তোরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তোরমাণ যখন কান্যকুব্জ ধ্বংস করিতেছেন, তখন হূণবিপ্লবে প্রবীণপ্রতীচ্য জ্ঞানালোক পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পঙ্গপাল আসিলে যেরূপ শ্যামল তৃণক্ষেত্রে দুর্ব্বাদল পর্য্যন্ত দেখা যায় না, সেইরূপ যে পথে হূণগণ চলিয়া যাইত, সে পথে জীবের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইত। উচ্চভূমি হইতে দেখিলে দীর্ঘ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভস্মীভূত গ্রাম ও নগরশ্রেণী হূণপ্লাবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত। ক্ষুদ্রাকার, বৃহৎশীর্ষ, ক্ষুদ্রনাসিক, মলিন, শ্বেতবর্ণ হূণ অশ্বারোহীকে দেখিবা মাত্র উত্তরাপথবাসিগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত, কালান্তকস্বরূপ হূণগণ অরণ্য বেষ্টন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিত

ও পলায়নপর নরনারীগণকে দূর হইতে বর্শা বা শরবিদ্ধ করিত। নগরাক্রমণ করিলেই ঝটিকাহত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় হূণগণ দুর্গপ্রাকার বা দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া অসহায় নাগরিকগণের উপর পতিত হইত, এক সময়ে নগরের নানা স্থানে অগ্নিসংযোগ করিত; তৈল-সিক্ত বস্ত্রে জড়িত জীবিত শিশুর গাত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া রাত্রিকালে আলোকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত; মাতার সম্মুখে শিশুকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া শাণিত তরবারির উপরে ধারণ করিত, হতভাগ্য শিশুর দ্বিখণ্ডিতদেহ ধূলিতে লুণ্ঠিত হইত। বৃদ্ধ সম্রাট্ অত্যন্ত পীড়িত। গোবিন্দগুপ্ত বহু কষ্টে মগধের সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ সংরক্ষণ অসম্ভব। এই সময়ে পুরগুপ্তের নামে তরুণী মহাদেবী সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন; বৃদ্ধ সচিব দামোদর শর্ম্মার সকল আশার অবসান হইল।

সম্রাটের শিবির স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিলে ক্রমশঃ দুই একজন ভিক্ষু সঙ্ঘারামে আসিয়া বাস করিল। ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বুদ্ধ অপেক্ষা উদরের প্রতি অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্ব্বাণ লাভাপেক্ষা তরুণী লাভের জন্য অধিক লোলুপ। ইহারা অর্থের জন্য নিরীহ তীর্থযাত্রিগণকে উৎপীড়িত করিত। ক্রমে ইহাদিগের ভয়ে তীর্থ-যাত্রিগণ আর স্তূপসান্নিধ্যে আসিতে চাহিত না। বেষ্টনী পরিক্রমণের পথ ও প্রাচীন গর্ভগৃহের দ্বার বনময় হইয়া উঠিল। একদিন নিশীথে দূরে বহু অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলে দৃষ্ট হইল, হূণসৈন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে সাম্রাজ্যের সৈনিকদিগকে ধীরে ধীরে স্তূপাভিমুখে তাড়িত করিয়া আনিতেছে। পরদিন প্রভাতে সম্রাটের সৈনিকগণ ভিক্ষুগণকে সঙ্ঘারাম হইতে দূর করিয়া

দিয়া বেষ্টনী সুরক্ষিত করিল। বুঝিলাম, পুণ্যক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দূর হইতে হূণ অশ্বারোহিগণ অবিরাম বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সুতীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত শরাঘাতে বেষ্টনীর স্থানে স্থানে আমাদিগের গাত্র ক্ষত হইতে লাগিল, বহু পরিশ্রমলব্ধ চিত্রগুলি বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু হূণ বা আর্য্য কোন জাতীয় সৈন্যই সে দিকে লক্ষ্য করিল না। প্রথম প্রহর অতীত হইলে হূণগণ অশ্বপৃষ্ঠে প্রথম বেষ্টনী পার হইবার চেষ্টা করিল, তখন বেষ্টনীর মধ্য হইতে সাম্রাজ্যের সৈনিকেরা নানাবিধ অস্ত্রবর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিল। এইরূপে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইলে হূণ অশ্বারোহিগণ স্তূপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন পূর্ব্বক বিশ্রামের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন দীর্ঘকায় আপাদমস্তকবর্ম্মমণ্ডিত জনৈক যুবা সৈনিক দক্ষিণ তোরণের বাহিরে আসিয়া শত্রুসৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেষ্টনীর মধ্যে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ বিশ্রামের আয়োজন করিতে লাগিল। তখনও দ্বিসহস্রের অধিক সৈনিক বেষ্টনীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। সেনাধ্যক্ষগণ হূণগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন যে, কিয়ৎক্ষণের জন্য যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে। সশাখা বৃক্ষসমূহ কর্ত্তৃক তোরণদ্বার চতুষ্টয় সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করিয়া সেনাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণ বিশ্রামার্থ স্তূপের উপরিভাগে ও পরিক্রমণের পথে শয়ন করিলেন। ক্রমে কেবল কতিপয় পদাতিক ও কয়েকটি কীরদেশীয় সারমেয় জাগিয়া রহিল। ক্রমে হূণস্কন্ধাবারে রন্ধনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, উভয়পক্ষের সেনাই সুষুপ্তিমগ্ন হইল। নিশা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া পিপীলিকার ন্যায় ধীরে ধীরে কয়েকটি নিশাচর জন্তু যেন বেষ্টনী অভিমুখে অগ্র-

সর হইতেছে। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা মনুষ্য, পশু নহে। ধীরে ধীরে একে একে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে পঞ্চবিংশতি জন হূণসৈনিক বেষ্টনী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তখন প্রহরীদলও নিদ্রিত, ক্ষীণদেহ দীর্ঘাকার কুক্কুরগুলি বেষ্টনী রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব তোরণের নিকটে আসিয়া হূণগণ নিমেষের জন্য দণ্ডায়মান হইল ও বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কর্পূর চূর্ণ চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে করিতে তোরণ অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু কর্পূরের তীব্রগন্ধ সারমেয়গণের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিকে অভিভূত করিতে পারিল না, কুক্কুরগুলি তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রক্ষিগণ নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল যে, দুইজন হূণ আলম্বনের উপর উঠিয়াছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শরাঘাতে নিহত করিল। অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া হূণসৈনিকগণ শৃঙ্গনিনাদ করিল। দূর হইতে শৃঙ্গরবে তাহার উত্তর আসিল। দূরে হূণশিবিরে শত শত উল্কা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সাম্রাজ্যের সৈনিকগণ চেতনা লাভ করে নাই। বজ্রের ন্যায় অবশিষ্ট হূণবাহিনী আসিয়া বেষ্টনী আক্রমণ করিল ও পরক্ষণেই বাধা প্রাপ্ত হইয়া শত হস্ত পিছাইয়া গেল। এইরূপে বার বার আক্রান্ত হইয়াও সাম্রাজ্যের সৈনিকগণ আত্মসমর্পণ করিল না। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে আলোক দৃষ্ট হইল, সাম্রাজ্যের সৈনিকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। হূণগণ পুনরায় বেষ্টনী আক্রমণ করিল। যখন আলম্বনের উপরিভাগে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন কতিপয় হূণসৈনিক তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে বৃক্ষকাণ্ডগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইরূপে প্রভাতের আক্রমণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বেষ্টনীর চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করা

মনুষ্যের সাধ্যাতীত। উল্লাসে কৃতান্তসদৃশ হূণ অশ্বারোহিগণ চীৎকার করিতে লাগিল ও বৃত্তাকারে পাষাণবেষ্টনীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। তাহারা জীবিত অবস্থায় একজনকেও বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইতে দিবে না। সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ম্মাবৃত যুবক তোরণ পথে অগ্রসর হইলেন। জনৈক হূণ পদাতিক তাঁহারা শিরস্ত্রণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিল। ফলে শিরস্ত্রাণের উর্দ্ধদেশ ভূমিতে পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে সমস্বরে উল্লাসে স্কন্দগুপ্তের জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইল। বাহিরে হূণগণ প্রমাদ গণিল। বহুদিন পরে স্কন্দ-গুপ্তকে দেখিয়া সৈনিকগণের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইল, স্কন্দগুপ্তের নেতৃত্বে পঞ্চশত সৈনিক অবলীলাক্রমে হূণব্যূহ ভেদ করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, পঞ্চাশৎসহস্র হূণসৈনিক চিত্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল, সেই পঞ্চশতের গতিরোধ তাহাদিগের সাধ্যাতীত। কেহ কেহ অরণ্যমধ্যে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই পঞ্চাশতের পশ্চাতে যাহারা অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদিগকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। অর্দ্ধশতাব্দী পরে জালন্ধরে বা উজ্জয়িনীতে হূণবৃদ্ধগণ বালকগণের নিকট স্কন্দগুপ্তের কোশলযুদ্ধের কাহিনী বলিত ও শিশুদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। শতবর্ষ পরে আর্য্যাবর্ত্তের মহিলা-গণ প্রভাতে হূণরাক্ষসগণের কবল হইতে দেবতা, রমণী ও শস্যক্ষেত্রের ত্রাণকর্ত্তৃস্বরূপ স্কন্দগুপ্তের নাম স্মরণ করিতেন; সুদূর বঙ্গদেশে ধীবর জ্যেষ্ঠগণ মহাবিপত্রাতা স্কন্দগুপ্তের নাম গান করিত ও ভক্তিজনিত অশ্রুজলে তাহাদিগের বক্ষ প্লাবিত হইত।

দহনের অসহ্য যন্ত্রণা যে কখনও অনুভব করে নাই তাহার পক্ষে আমাদিগের বর্ণনাতীত যন্ত্রণা বোধগম্য নহে। আলম্বন, স্তম্ভ ও সূচীর
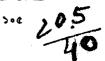
অভ্যন্তরস্থ স্থান ও তোরণগুলি বৃক্ষকাণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। তাহাতে অগ্নি প্রযুক্ত হইলে সরস তরুগুলি ধীরে ধীরে শুষ্ক হইতে লাগিল ও অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তাহার শিখা গগন স্পর্শ করিল। তখন বুঝিলাম, প্রাচীন স্তূপের বিনাশের দিন আসিয়াছে। আৰ্ত্তিমিদর কর্তৃক স্বহস্তে বহুযত্নে নির্ম্মিত দক্ষিণ তোরণের শীর্ষস্থিত ধর্ম্মচক্র সশব্দে ভূমিতলে পতিত হইল, উত্তর তোরণের অষ্টকোণ স্তম্ভ সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল, নানাস্থানে বেষ্টনীর স্তম্ভগুলি ধরাশায়ী হইল, লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করিল। ক্রমে বেষ্টনীর পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্ব হইতে বিদীর্ণ পাষাণের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, উত্তাপ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বর্ত্তুলাকৃতি স্তূপ কম্পিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র বজ্রনির্ঘোষের মিলিত ধ্বনির ন্যায় শব্দ পৃথিবী হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। ধনভূতির বহুযত্ননির্ম্মিত স্তূপ, মহাস্থবিরের ভিক্ষালব্ধ অর্থে নির্ম্মিত স্তূপ সিংহদত্তের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তথাগতের শরীর, একত্র সমাহিত হইতে চলিয়াছে। মহাশব্দে গর্ভগৃহ শরীরনিধানের আধারের উপরে পতিত হইল। তদপেক্ষা ভীষণ শব্দে পাষাণনির্ম্মিত অৰ্দ্ধবৰ্ত্তুল দ্বিধা হইয়া গেল। গুরুভার পাষাণ পতনের ও বিদারণের শব্দ সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির ধ্বংসসূচক শব্দকে ক্ষণেকের জন্য পরাস্ত করিল, ধূলি ও ধূমের স্তম্ভ নীল আকাশ স্পর্শ করিল। যন্ত্রণার লাঘব হইবার পূর্ব্বেই চিন্তা করিতে লাগিলাম, স্তূপ ধ্বংস হইল, কিন্তু সিংহদত্তের বহু আয়াস-সঞ্চিত তথাগতের শরীর তক্ষশিলায় প্রেরিত হইল না। শুনিয়াছিলাম তক্ষশিলায় মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরিস্থিত শ্যামল তৃণক্ষেত্রে বক্রনাশা দরদ মেষপাল মেষচরণ ও বংশীবাদন করে। পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে

তক্ষশিলার আবালবৃদ্ধবনিতা হূণগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। আকুল হইয়া সিংহদত্তকে ডাকিলাম। স্তূপ ধ্বংস করিয়া অগ্নিরাশি অরণ্যের চতুষ্পার্শ্বে ধাবিত হইয়াছে, মণ্ডলাকার ধূমরাশি মেঘরাজ্যে উত্থিত হইতেছে; দেখিলাম, যেন তেজঃস্নাত দিব্যদেহ সিংহদত্ত সহাস্য বদনে দিবাকরের রাজ্য হইতে অবতরণ করিতেছেন। সিংহদত্তের ছায়া স্তূপের ধ্বংসাবশেষের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিল, দারুণ যন্ত্রণায় আকুল পাষাণ-কণাগুলিকে যেন বলিতে লাগিল "যাহার অস্থির উপরে এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি যে স্থানে আসিয়াছেন আমিও সেই স্থানে আসিয়াছি। পাটলিপুত্রবাসী মহাস্থবির, ধনভূতি, অপূর্ব্বশিল্পদক্ষ যবন-শিল্পিগণও সেইস্থানে আসিয়াছেন। তথায় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, যতি বা ভিক্ষু, স্তূপ বা মন্দির কাহারও আবশ্যকতা নাই। তক্ষশিলার নাগরিকগণ চিরদিনের জন্য তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিয়াছে। ধনভূতির নগরবাসিগণ তাহার শত শত বর্ষ পূর্ব্বে তাহাদিগের নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি দর্প করিয়া বলিয়াছিলাম যে, নগরবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্মে যদি কখনও বীতশ্রদ্ধ হয় তাহা হইলে তথাগতের শরীরনিধান যেন তক্ষশিলার মহাবিহারের অধ্যক্ষকে প্রত্যর্পণ করা হয়। আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। ধনভূতির নগর তক্ষশিলার পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাগতের শরীরনিধান সমভাবে পূজিত হইয়া আসিয়াছে। স্তূপ যে দিন ধ্বংস হইল, সে দিন কিন্তু আর তক্ষশিলায় তথাগতের শরীরনিধান গ্রহণ করিতে জনমাত্রও নাই। অশরীরী সিংহদত্ত ধূম, ধূলি ও সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন। তখন দূরে পর্ব্বতের সানুদেশে প্রজ্বলিত বনরাজি অমানিশার ঘোর-অন্ধকার নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

পঞ্চশত সৈনিক লইয়া স্কন্দগুপ্ত কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন তাহা তোমাদিগের পিতৃপুরুষেরা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কীটদষ্ট জীর্ণগ্রন্থ উদ্ধার কর, তাহার সন্ধান পাইবে। চাহিয়া দেখ, কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চশত সৈনিক গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছে, ত্রস্ত নগরবাসিগণ অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। একজন সৈনিক উচ্চৈঃস্বরে কি বলিল। চাহিয়া দেখ, পলায়নপর নগরবাসিগণ ফিরিতেছে, দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ নগ্নপদ শিরস্ত্রাণবিহীন, যুবকের সম্মুখে নতজানু হইতেছে। আগন্তুকগণের আগমন-সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত দগ্ধাবশিষ্ট নগরীর চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। নগরের প্রধান দণ্ডনায়ক স্থাণুদত্ত আসিতেছেন। যে জনতা, পথশ্রমে ক্লান্ত, মলিনবেশধারী, বুভুক্ষু সৈনিকগণের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। কম্পিতপদে হস্তী ও অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পলিতকেশ স্থাণুদত্ত নগ্নশীর্ষ যুবকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, সৈনিকগণ প্রত্যেকে শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিতেছে। প্রতিষ্ঠানের দণ্ডনায়ক হইবার পূর্ব্বে স্থানুদত্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বে তাঁহার অশ্ব প্রতি যুদ্ধে দৃষ্ট হইত। তিনি কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্তের শিক্ষাগুরু, স্কন্দগুপ্তের পিতামহকল্প। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে জ্যেষ্ঠপুত্র তনুদত্ত। তিনি স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন যে, রাজশক্তির সহায়তা পাইলে বৃদ্ধ পিতার অনুজ্ঞাক্রমে তিনি হূণবাহিনী মরুপারে রাখিয়া আসিবেন। সেই জন্য হূণরাজ তোরমাণের আদেশে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুত্র হরিদত্ত প্রতিষ্ঠান

নগরীর রক্ষাকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। স্থাণুদত্তের বামপার্শ্বে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতিষ্ঠান নগরীর অধিষ্ঠানাধিকরণ বিচারপতি নাগদত্ত। অপুত্রক নাগদত্ত বৃদ্ধ পিতার ক্লেশ, জ্যেষ্ঠের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আকুল, হরি দত্তের বিয়োগজনিত অশ্রু তখনও শুষ্ক হয় নাই। লৌহনির্ম্মিত ত্রিশূলে ভর দিয়া স্থাণুদত্ত অগ্রসর হইলেন। শিরস্ত্রাণবিহীন যুবককে দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি "মহারাজ" মাত্র উচ্চারণ করিয়া নির্ব্বাক হইলেন। এই সম্বোধনে স্কন্দগুপ্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন।

ধীরে ধীরে তনুদত্ত সকল কথা বিবৃত করিলেন, কুমারগুপ্ত ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, বালক পুরগুপ্ত নামে মাত্র সম্রাট; যুবতী বিধবা মজ্জনোন্মুখ তরণীর কর্ণধার, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অলৌকিক শিক্ষার ফলে দামোদরশর্ম্মা ও গোবিন্দগুপ্ত নতশিরে আজ্ঞানুপালন করিতেছেন। বৃদ্ধ দামোদরশর্ম্মা দুশ্চরিত্রা মহিষীর বিলাস ব্যসনের ব্যয় বহন করিবার জন্য প্রজাপীড়ন করিতেছেন, অর্দ্ধভুক্ত অস্ত্রবিহীন সেনাদল লইয়া গোবিন্দগুপ্ত মগধরক্ষায় নিযুক্ত আছেন। নতজানু হইয়া তিন পিতাপুত্র ভিখারীকে সম্রাট বলিয়া অভিবাদন করিলেন, ভগ্নস্বরে স্থাণুদত্ত কহিলেন, "সমুদ্রগুপ্তের নীতি অনুসারে সম্রাজ্যের যাহা অবশিষ্ঠ আছে আপনি তাহার অধীশ্বর। বংশ লোপ হইয়াছে, তথাপিও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। নাগদত্ত প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিবে, একহস্ত পুত্র ও অশীতিপর পিতা ছায়ার ন্যায় সম্রাটের অনুসরণ করিবে। মহারাজ, এই শীর্ণ দুর্ব্বল হস্তে মহাভার গরুড়ধ্বজ

সিপ্রাতীর হইতে পশ্চিম সমুদ্রের তটে আনয়ন করিয়াছিলাম। সম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য এখনও তাহা পুনরায় সিন্ধুতীরে স্থাপিত করিতে পারি।" নগ্নশীর্ষ, নগ্নপদ, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, ভগ্নবর্ম্মাবৃত দীন হীন ভিক্ষুক সম্রাট পিতামহের পার্শ্বচরকে আলিঙ্গন করিলেন। চাহিয়া দেখ, নবীনবলে বৃদ্ধ স্থানুদত্ত হস্তিপৃষ্ঠে গুরুভার গরুড়ধ্বজ ধারণ করিয়াছেন, সাম্রাজ্যের সেনাদল হূণযুদ্ধে পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। জাহ্নবীতীরে, ব্রহ্মাবর্ত্তে, তোরমাণ পরাজিত হইলেন; বুঝিলেন, গুপ্ত সাম্রাজ্য নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে এই তাঁহার প্রথম পরাজয়। দুর্লঙ্ঘ্য গোপাদ্রিশিখরে হূণরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রেবা হইতে জাহ্নবীতীর পর্য্যন্ত আটবিক প্রদেশ-সমূহ হূণগণের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। জাহ্নবীর উত্তর তীর হইতে হিমাদ্রির চরণপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে; উত্তর মরু হইতে নূতন সেনাদল না আসিলে তোরমাণের আর রক্ষা নাই, গোপাদ্রির পতন অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। দূত আসিয়া সংবাদ দিল, চরণাদ্রিশিখরে গোবিন্দগুপ্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ান, স্কন্দগুপ্তের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা পাটলিপুত্রে জ্ঞাপিত হইয়াছে, বৃদ্ধ খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের দর্শনবাঞ্ছা করিয়াছেন। সম্রাটের গোপাদ্রি অধিকার করা হইল না, নতশির ক্ষুব্ধ স্কন্দগুপ্ত তোরমাণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন; সন্ধিসূত্রে স্কন্দগুপ্ত গোপাদ্রিদুর্গ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা রহিল। শুভ্রকেশ স্থাণুদত্তকে গোপাদ্রি-রক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া স্কন্দগুপ্ত অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে চরণাদ্রি অভিমুখে আসিতেছেন। চাহিয়া দেখ, চরণাদ্রিশিখরে গিরিদুর্গের অভ্যন্তরে

কক্ষমধ্যে মুমূর্ষু গোবিন্দগুপ্ত সম্রাটকে শেষ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রবণ কর, কক্ষমধ্যে গুরু গম্ভীর স্বর এখনও ধ্বনিত হইতেছে "স্কন্দ, সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজের সম্মান রক্ষা করিও, দেখিও তোরমাণের বংশজাত কেহ যেন কখনও পাটলিপুত্রের সিংহাসনে না আরোহণ করে। দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও। আর দেখিও, স্কন্দ, যদি পার, যাহার জন্য সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল তাহার যথোচিত শাস্তিবিধান করিও। বিমাতা বলিয়া ভীত হইও না। সে তোমার পিতার পরিণীতা পত্নী নহে। চাহিয়া দেখ, মগধ, তীরভুক্তি, কাশী ও কোশলের প্রজাসমূহ রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিয়াছে। তাহারা বলে, রাজা শস্যরক্ষা করিলে ষষ্ঠভাগ পাইবেন, নতুবা নহে। সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত নীতি অনুসারে গুপ্তবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের অধিকারী; সাম্রাজ্য স্কন্দগুপ্তের পুরগুপ্তের নহে। চাহিয়া দেখ, উদ্দণ্ডপুরদুর্গে মহাদেবী ও পুরগুপ্ত আবদ্ধ রহিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক তোরমাণ পুনরায় গোপাদ্রি আক্রমণ করিয়াছে, দূতপ্রেরণ না করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিয়াছে, পুনরায় হূণযুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় হূণযুদ্ধে মৈত্রকসেনাপতি ভট্টারক কেন রাজপদে বৃত হইয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্ত কেন স্বহস্তে সমুদ্রগুপ্তের মুকুট লইয়া ভট্টারকের শিরে স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস এখনও লুপ্ত হয় নাই। স্তূপধ্বংসের সহিত আমাদিগের মনুষ্যদর্শনের আশা দূর হইয়াছে, বহির্জগতের সংবাদ পাইবার আশাও দূর হইয়াছে।

---

[১০]

স্কন্দগুপ্ত যখন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর সিংহাসন স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে আমাদিগের ধ্বংসাবশেষের উপর নবীন তৃণরাজি অধিকার বিস্তার করিতেছিল। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে নব দুর্ব্বাদল আমাদিগের ধ্বংসাবশেষের উপরি-ভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, স্থানে স্থানে অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিতেছে, দেখিতে পাইলাম ; কারণ, সুবৃহৎ স্তূপ ধ্বস্ত হইলেও আমি তখনও উচ্চশীর্ষ ছিলাম। বর্ষা অতীত হইলে দেখিলাম, স্তূপ ও বেষ্টনী নবদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত হইয়াছে ; বিশাল স্তূপের অস্তিত্বের সামান্য চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান, স্থানে স্থানে কেবল মাংসবিহীন কঙ্কালের ন্যায় বেষ্টনীর স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান। যত দূর দৃষ্ট হয়, তত দূর শ্যামল তৃণক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইতে-ছিল না ; বোধ হইল, আটবিক প্রদেশ পুনরায় জনশূন্য হইয়াছে। দূরে উচ্চ মৃৎপিণ্ড লক্ষিত হইতেছিল ; অনুমানে বুঝিলাম, তাহাই ধনভূতির নগরের ধ্বংসাবশেষ সম্মুখে মৃৎপিণ্ডের উপর দুইটি ক্ষুদ্রতর মৃৎপিণ্ড প্রাচীন নগর তোরণের অবস্থানের পরিচয় দিতেছিল। হেমন্তের মধ্যভাগে একদিন প্রভাতে আমাদিগের উত্তরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, যেন কে ধীরে ধীরে স্তূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্তূপের দিকেই বলিলাম। তুমি হয়ত বলিবে, স্তূপের অস্তিত্বলোপ হইয়াছে, কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে আমি অত্যন্ত বেদনা অনুভব করি। আমি বলিব, স্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে—অশোকের ন্যায় বা কনিষ্কের ন্যায় সদ্ধর্ম্মানুরাগী কোন সম্রাট আসিয়া ধ্বংসাবশেষের

মধ্য হইতে প্রাচীন স্তূপের সংস্কার করিবেন। সহস্র বৎসর আমি সেই ভরসায় দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি দেখিতাম, ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে নূতন স্তূপ উত্থিত হইয়াছে, পুরাতন সংস্কৃত হইয়াছে, জীর্ণ পাষাণের পরিবর্ত্তে নূতন পাষাণ আনীত হইয়াছে, পত্রপুষ্পমাল্যচন্দনে স্তূপ আবার সুশোভিত হইয়াছে। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দেখিতাম, সায়ংকালীন স্নান ও প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া প্রজ্বলিত মধুজবর্ত্তিকা হস্তে নাগরিক ও নাগরিকাগণ তোরণপথে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, দলে দলে ভিক্ষুগণ স্তূপ প্রদক্ষিণ করিয়া তথাগতের পূজা করিতেছেন, সশব্দে গর্ভগৃহের পাষাণময় দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে, শিলানির্ম্মিত আধারে রক্ষিত তথাগতের শরীর দীপালোকে অর্চ্চিত হইতেছে, গন্ধে ও পুষ্পে গর্ভগৃহের পথ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উষাকালে পক্ষিগণের শব্দে সে সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া যাইত, অল্পক্ষণ পরেই নিষ্ঠুর আলোক আসিয়া আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিত; দেখিতাম, স্তূপের পরিবর্ত্তে শিশিরসিক্ত তৃণদল বন্ধুর মৃৎপিণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে মাংসবিহীন নরদেহপঞ্জরের ন্যায় কয়েকখণ্ড পাষাণ মস্তক উত্থিত করিয়া আছে।

মনে হইল, দূরে কে যেন বহুকষ্টে পাদচারণা করিতেছে, তাহার চরণদ্বয় আর যেন তাহাকে বহন করিতে অক্ষম;—দেহভারক্লিষ্ট হইয়া সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিতেছে, ও পরক্ষণেই আবার যেন কোন আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে নিকটে আসিলে দেখিলাম জীর্ণবাস পরিহিত দশনহীন, শুক্ল কেশ লোলচর্ম্ম জনৈক মনুষ্য স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। স্তূপের

মৃৎপিণ্ডের সন্নিধানে আসিয়া সে সর্ব্বপ্রথমেই আমাকে দেখিতে পাইল ; কারণ, আমার মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ছিল। আমার নিকটে আসিয়া বৃদ্ধ যেন যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল, সে পাষাণে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বহুক্ষণ বিশ্রাম করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে স্তূপ ও বেষ্টনী পরিক্রমণের পথ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিল ও আমার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া উপবেশন করিল। সমস্ত দিন বৃদ্ধ ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিল। কোন স্থানে স্থানচ্যুত স্তম্ভ অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে, কোন স্থানে ভগ্ন সূচীর আশ্রয়ে মণ্ডূককুল আশ্রয়লাভ করিয়াছে ; ভগ্নশীর্ষ তোরণস্তম্ভের শীর্ষদেশে বিহঙ্গম নীড় রচনা করিয়াছে ; যে স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান আছে তাহাদিগের বিকল অঙ্গ অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপ ও দাহিকাশক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে, সূচীতে ও স্তম্ভে খোদিত চিত্রগুলি হূণের অস্ত্র ও অগ্নির আক্রমণে বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে ; আলেখ্যগুলিতে ভগ্নশির বা ছিন্ননাসা মনুষ্যমূর্ত্তি নিচয় স্তূপের ও বেষ্টনীর বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। অর্দ্ধভগ্ন কোন স্তম্ভদ্বয়ের শীর্ষদেশে বৃক্ষশাখা স্থাপিত করিয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের সাহায্যে ও বন হইতে কুশ সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃদ্ধ এক অপূর্ব্ব কুটীর রচনা করিল এবং সূর্য্যালোক বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে তন্মধ্যে শুষ্ক দর্ভের শয্যা রচনা করিয়া বিশ্রামলাভ করিল। তদবধি বৃদ্ধ আমাদিগের নিত্যসহচর হইল। সে প্রভাতে উঠিয়া প্রাচীন নগরের প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র নদীতে স্নান করিয়া আসিত ও বন্য-পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মৃৎপিণ্ডের অর্চ্চনা করিত, তাহার পর দিবা দ্বিপ্রহর অবধি আমার ছায়ায় বসিয়া আপন মনে কি বলিত, প্রতিদিন "বিমলা-কীর্ত্তি ভট্টারিকানিষ্পাদিতা" এই কথা বলিয়া মৃৎপিণ্ডকে নমস্কার

করিত, এতদ্ব্যতীত তাহার আর কোন কথাই বুঝিতাম না। অপরাহ্নে বৃদ্ধ আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টায় বন মধ্যে প্রবেশ করিত, বনজাত ফলেই তাহার আহার নিষ্পন্ন হইত, কিন্তু কখনও কখনও সে পত্রনির্ম্মিত আধারে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া আনিত। বোধ হয়, দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য সে বন পথ অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিত। এইরূপে শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা অতীত হইয়া গেলে, ক্রমে ক্ষুদ্র বট ও পিপ্পল বৃক্ষ গুলি নাতিবৃহৎ ছায়া-প্রদ তরু হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ আমাদিগের সহিত শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

তোরমাণের পুত্র মিহিরকুলের অধীনে হূণগণ দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইতেছিল। গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অবিরাম গতিতে হূণগণ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিতেছিল, তোরমাণের মৃত্যুর পর হইতে হূণ জাউল-গুলি উপযুক্ত নেতার অভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। মিহিরকুলের চেষ্টায় তাহার অধিকাংশ পুনরায় একত্রিত হইল। হূণবাহিনী মগধাভিমুখে অগ্রসর হইল। দ্বিতীয় বাহিনী মিহিরকুলের কনিষ্ঠ খিঙ্গিলের অধীনে জনহীন মরু অতিক্রম করিয়া সৌরাষ্ট্রাভিমুখে ধাবিত হইল; বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় নগরশীর্ষের গরুড়ধ্বজ ধরাশায়ী হইল। কালিন্দী অতিক্রম করিয়া মিহিরকুল ব্রহ্মাবর্ত্তে শিবির স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধ সম্রাট দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াও বারাণসী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মাবর্ত্তে তনুদত্ত ও প্রতিষ্ঠানে নাগদত্ত সীমান্তরক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। সিংহবিক্রম স্থাণুদত্তের পুত্র ভাগীরথীর তীর্থ রক্ষা করিতেছিলেন; জলধিতুল্য হূণ সৈন্যের পরপারে পদার্পণ করিবার সাহস হইতেছিল না। আর প্রতিষ্ঠানে নাগদত্ত

নৌবাটক লইয়া বেণীত্রয় রক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট্ চরণাদ্রিদুর্গে সৌরাষ্ট্রের পতনসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন ; আরও শুনিলেন, আনর্ত্তের সহিত মালবও সাম্রাজ্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। শুনিয়া বৃদ্ধের শির নত হইল। চরণাদ্রিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া জাহ্নবীকে সাক্ষী করিয়া, তরবারি স্পর্শ করিয়া, বৃদ্ধ শপথ করিলেন, মালব ও আনর্ত্ত, মৎস্য ও মরু পুনরধিকার না করিয়া পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন করিবেন না। শপথশ্রবণে বিজ্ঞ সেনানীগণেরও হৃদয় কম্পিত হইল। স্কন্দগুপ্ত আর একবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চরণাদ্রিদুর্গে, খুল্লতাত গোবিন্দগুপ্তের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া যুবক সম্রাট্ শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশে কেহ কখনও মগধের সিংহাসন রক্ষার জন্য বিবাদ করিবে না। শান্তনুপুত্রের ন্যায় ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সম্রাট দারপরিগ্রহ করেন নাই। উদ্দণ্ডপুরদুর্গে অবরুদ্ধ হৃতসিংহাসন পুরগুপ্ত মগধসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। চরণাদ্রি হইতে সৌরাষ্ট্র বহুদিনের পথ, মগধে যাহারা স্ত্রীপুত্র রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আশা পরিত্যাগ করিল। সম্রাট্ চরণাদ্রি হইতে প্রতিষ্ঠানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মিহিরকুলের আহ্বানে প্রতিদিন শত শত হূণ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিতেছিল। তাহাদিগের আক্রমণে গান্ধারে শত শত বর্ষব্যাপী কুষাণাধিকার লুপ্ত হইল, কণিষ্কের সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। গঙ্গাতীরে প্রতিদিন হূণগণের বলবৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সৈন্য সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া মিহিরকুল পুনরায় নদী পার হইবার আদেশ দিলেন ; বহুচেষ্টা সত্ত্বেও তন্দুদত্ত সে ভীষণ আক্রমণ রোধ করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের

দ্বিতীয় যুদ্ধে তনুদত্তের পরাভব বার্ত্তা জ্ঞাত হইলেন। প্রতিষ্ঠানের ভীষণ দুর্গ তুমি বোধ হয় দেখিয়াছ, সেরূপ সুদৃঢ় দুর্গ তৎকালে মধ্যদেশে আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে দুর্গটি অবস্থিত ছিল ও উহা অধিকার না করিয়া পূর্ব্বে বারাণসী বা পশ্চিমে অন্তর্ব্বেদী অধিকার করা অসম্ভব ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য অতীত হইবার শত শত বর্ষ পরেও প্রতিষ্ঠান আর্য্যাবর্ত্তে রাজশক্তির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; বহু শতাব্দী পরে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট সৈনিকগণ ছায়ায় বসিয়া প্রতিষ্ঠানের ভীষণ দুর্গের বর্ণনা করিত। ধীরে ধীরে স্থাণুদত্তের পুত্র মিহিরকুলকে সম্মুখে রাখিয়া বেণীতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন তনুদত্ত ও নাগদত্ত দুর্গরক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন; দেখিতে দেখিতে পবিত্র প্রতিষ্ঠানপুর অস্পৃশ্য হূণগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। বৃদ্ধ সম্রাট দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া সাম্রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সৌরাষ্ট্রে পর্ণদত্ত তখনও গুপ্তা-ধিকার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানদুর্গ অবরোধকালেও মিহিরকুলের বলবৃদ্ধি হইতেছিল; সুতরাং স্বীয় বলবৃদ্ধির জন্য স্কন্দগুপ্তকেও বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। অবসর পাইলেই সম্রাট দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী নগরগুলি হইতে সৈন্যদল পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন; এইরূপে প্রতিষ্ঠান অবরোধে হূণরাজের বর্ষত্রয় অতিবাহিত হইল। উভয়পক্ষেই সৈন্য সংগ্রহ হওয়ায় কোন পক্ষেরই আশু জয়লাভের আশা রহিল না। তরুণবয়স্ক মিহিরকুল বিলম্বে বিচলিত হইলেন ও সে সংবাদ স্কন্দগুপ্তের কর্ণগোচর হইল। প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের তখন অন্তিম দশা, স্কন্দগুপ্তের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের উদ্ধার হইল না, অর্দ্ধসৈন্য অবরুদ্ধ দুর্গের পরিখাপার্শ্বে

রাখিয়া মিহিরকুল অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইতেন ও বর্ষাসমাগমে পুনরায় পরিখাপার্শ্বে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে বারাণসী হইতে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তর তীরস্থিত ভূখণ্ড জনমানব শূন্য হইল। ক্রমে প্রতিষ্ঠান দুর্গে আহার্য্যের অভাব অনুভূত হইল। সম্রাট বুঝিলেন, আর অধিকদিন দুর্গরক্ষা সম্ভব হইবে না।

সেই সময় হইতে সম্রাট প্রতিদিন যথাসাধ্য নাগরিকগণকে নগর হইতে দূরে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সুস্থ, সবলকায়, অস্ত্রধারণক্ষম ব্যক্তিগণকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নগর জনশূন্য হইল ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দুর্গবাসিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শত্রুসৈন্যের অধিকারে আসিল। লোকে বলিত, প্রতিষ্ঠান অবরোধের শেষবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মাধিক্য বহুকালযাবত আর্য্যাবর্ত্তে অনুভূত হয় নাই। বহু কষ্টে, বহু অর্থব্যয়ে বুভুক্ষিত পাষাণরাশির মধ্যে রচিত প্রতিষ্ঠানদুর্গের কূপগুলিতে অধিক জল থাকিত না ও গ্রীষ্মকাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই সেগুলি প্রায় শুষ্ক হইয়া যাইত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গাজল আনয়ন করিবার জন্য যে পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠানযুদ্ধের প্রারম্ভে তাহা হূণগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে দুর্গমধ্যে নদীর জলই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু অবরোধের প্রারম্ভে পয়ঃপ্রণালী বদ্ধ হওয়ায় উষ্ট্রবাহনে যমুনা-সঙ্গম হইতে জল আসিত ও যথাসম্ভব কূপোদক ব্যবহৃত হইত। নগর হূণসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে জল আনয়নের পথ রুদ্ধ হইল। তখন কূপোদকই অবরুদ্ধ সৈনিকমণ্ডলীর একমাত্র ভরসাস্থল হইল। নগর পরিত্যাগকালে সম্রাট অনুমান করিয়াছিলেন যে, দুর্গ নগর অপেক্ষাও সামান্য লোকবলে রক্ষিত হইতে পারে; সুতরাং, নগর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিলে আহার্য্যদ্রব্য অল্প-

লোকে অধিক দিন ব্যবহার করিতে পারিবে। তিনি জানিতেন যে, নগর পরিত্যাগ করিলে দুর্গমধ্যে জলের অভাব হইবে; কিন্তু তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, অল্পসংখ্যক সৈন্য কূপোদক পানে জীবনরক্ষা করিয়া বর্ষাগম পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিবে এবং তাঁহার ভরসা ছিল যে, ততদিন কোনও না কোন প্রদেশ হইতে সাহায্য আসিবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পতন সময় সে বৎসর যে গ্রীষ্মাধিক্য হেতু বৈশাখের প্রারম্ভে দুর্গমধ্যে জলাভাব হইবে তাহা তিনি কখনও অনুমান করেন নাই। বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন প্রভাতে সম্রাট সংবাদ পাইলেন যে, কূপগুলিতে দুই দিনের অধিক সময়ের উপযোগী পানীয় জল নাই। তখন তিনি দুর্গ প্রাকারে আরোহণ করিয়া যমুনা-সঙ্গমের শুষ্ক বালুকারাশির উপর শত্রু শিবির পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দিন দ্বিপ্রহরে মন্ত্রণাগৃহে সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও সেনাপতিগণ স্থির করিলেন যে, তৃতীয় দিবসের পর দুর্গরক্ষা সম্ভবপর নহে। অর্দ্ধাহারে বা অনশনে সৈনিকগণ যুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু জলাভাব হইলে অবরুদ্ধ সেনাদলকে শান্ত করা কঠিন। মন্ত্রণায় স্থির হইল, রাত্রিকালে সম্রাট স্বয়ং কালিন্দী হইতে জল সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন; কিন্তু যে দিন জল সংগৃহীত না হইবে তাহার পরদিন দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুর্গ পরিত্যাগের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সম্রাট ঈষৎ হাস্য করিলেন। যাহারা প্রথম হূণযুদ্ধে স্কন্দগুপ্তকে দেখিয়াছিল তাহারা সে হাস্যের অর্থবোধ করিয়া শিহরিল। রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে যমুনাসৈকত উভয় পক্ষীয় সৈন্যের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। জলবাহী উষ্ট্রসমূহ কালিন্দীতীর হইতে দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমনকালে হূণগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, বহু চেষ্টাসত্ত্বেও সম্রাটের সৈনিকগণ উষ্ট্রগুলির উদ্ধার করিতে পারিল না। সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াও কিছু করিতে

পারিলেন না। হূণগণ তখন দুর্গ ও কালিন্দীতীরের মধ্যভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। সম্রাট কিছুতেই শত্রুদল ভেদ করিতে পারিলেন না। বহুশ্রমে ও অনাহারে ক্লিষ্ট সৈনিকগণ বৃথাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে স্বয়ং মিহিরকুল দুর্গপ্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামগুপ্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লৌহদ্বার অনায়াসে তাঁহার গতিরোধ করিল। সম্রাটের সেনাদল নির্ব্বিঘ্নে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। বৈশাখী কৃষ্ণ প্রতিপদের প্রত্যুষে বৃদ্ধ সম্রাট দুর্গপ্রাঙ্গণে অবশিষ্ট সেনা সমবেত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন যে, জলাভাবে দুর্গরক্ষা অসম্ভব, কিন্তু তিনিও প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে অসম্মত, প্রতিষ্ঠান হস্তচ্যুত হইলে রেবা হইতে জাহ্নবী পর্য্যন্ত ও জাহ্নবী হইতে হিমবান পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড হূণগণের করতলগত হইবে, পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী লুণ্ঠিত হইবে ও পাটলিপুত্র ব্যতীত সংরক্ষণের দ্বিতীয় স্থান থাকিবে না। বৃদ্ধ কহিলেন, পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে আটবিক প্রদেশে বনদুর্গ অবরোধকারী হূণমণ্ডল ভেদ করিয়া পঞ্চশত সৈনিক প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিল; সুতরাং পঞ্চ সহস্রের পক্ষে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চরণাদ্রি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যদি প্রত্যাগমন করিতে হয় তাহা হইলে কালিন্দীর মলিন জলপান করিয়া যাইতে হইবে, নতুবা আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল বক্ষে তাহাদিগের আর স্থান হইবে না। সেনাপতি ও সৈন্যগণ নীরবে এ কথা শ্রবণ করিলেন। অবশিষ্ট কূপোদক স্নানে ও পানে ব্যয়িত হইল। সন্ধ্যার প্রাকালে দুর্গের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইল, বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে হূণগণ দেখিল, উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য কালিন্দী-সৈকতে

আত্মবিসর্জ্জন করিতে চলিয়াছে। ধীরে ধীরে খুঙ্খান ও মিহিরকুলের অধীনে লক্ষ লক্ষ হূণসৈন্য পঞ্চসহস্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। হস্তিপৃষ্ঠ হইতে তোরমাণ দেখিলেন, শুভ্রকেশ শুভ্রবসনপরিহিত বৃদ্ধ সম্রাট স্বহস্তে হৈম গরুড়ধ্বজ ধারণ করিয়া শ্বেতাশ্বারোহণে তির্য্যক-ব্যূহের পুরোদেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। হূণসৈন্যের অধিকাংশ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠনে মনোযোগ দিয়াছে, কেহ কেহ শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। স্কন্দগুপ্তের রণকৌশলের কথা তিনি বহুদিন হইতে শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন। শত শত হূণ ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রথম যুদ্ধের বিবরণ দেশে দেশে প্রচারিত করিয়াছিল। তরুণ হূণরাজ ভাবিলেন, ভয়ে বৃদ্ধের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। সম্মুখে যমুনা, উত্তর পার্শ্বে অপরিমিত শত্রু-সৈন্য, পশ্চাতে শত্রু হস্তগত ভীষণ দুর্গ, এইরূপ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃথিবীতে কয়জন সৈনিক প্রত্যাগমনের আশা করিয়া থাকে? ধীরে ধীরে হূণসৈন্য মুষ্টিমেয় বিপক্ষদলকে পেষণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখিল, সংখ্যায় হীন হইলেও সে তির্য্যক্‌ব্যূহ যেন বজ্র নির্ম্মিত। ব্যূহের পূর্ব্বকোণে স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন; ক্রমে ক্রমে ব্যূহের পূর্ব্ব কোণ কালিন্দীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিহিরকুল ভাবিলেন, শত্রু স্বেচ্ছায় কালিন্দীর জলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে যাইতেছে। তখন তিনি হূণসৈন্যের গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া হূণগণ শত্রুব্যূহের উভয় পার্শ্বে ও দুর্গের সম্মুখে আক্রমণ করিল, ব্যূহ দ্রুতবেগে নদীর জল স্পর্শ করিতে ধাবিত হইল। সর্ব্বাগ্রে রক্তাক্ত অশ্বে রক্তার্দ্রপরিচ্ছদ বৃদ্ধ স্কন্দগুপ্ত। যমুনাগর্ভে দণ্ডায়মান হইয়া অল্প সংখ্যক সৈন্য হূণগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু দ্বিসহস্রের অধিক সৈন্য অবলীলাক্রমে সন্তরণে নদী পার হইয়া গেল। মিহিরকুল

ভাবেন নাই যে, অবশিষ্ট শত্রুসৈন্য তাঁহার গ্রাস অতিক্রম করিবে। রোষে উন্মত্ত হইয়া তিনি স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্যগণের প্রতি সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন। তখন মরণোন্মুখ অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পরশু হস্তে স্কন্দগুপ্ত যমুনার আর্দ্রসৈকতে হূণরাজের সম্মুখীন হইলেন। দুর্গপ্রাকার হইতে ত্রিহস্ত পরিমিতি শর আসিয়া বৃদ্ধের দক্ষিণ চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে উত্তোলিত দীর্ঘপরশু সেই সময়ে হূণরাজের অশ্বের মস্তক ছেদন করিল। অশ্বহীন মিহিরকুল ও সম্রাট স্কন্দগুপ্তের প্রাণহীন দেহ একত্র বালুকাময় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল। সম্রাটের অবশিষ্ট সৈনিকগণ ভট্টারকের দেহ রক্ষার্থ একত্রিত হইল, তখন অবশিষ্ট সেনাদল পরপারে উপস্থিত হইয়াছে। হূণগণ প্রচণ্ড বিক্রমে মিহির কুলকে উদ্ধার করিবার জন্য শত্রুসেনা আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রভুভক্ত সৈন্যদল সম্রাটের দেহ আচ্ছন্ন করিয়া ভূপতিত হইল, দূরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ নেত্রে তোরমাণের পুত্র প্রতিষ্ঠানের শেষ যুদ্ধ অবলোকন করিলেন। সম্রাটের একজন মাত্র সৈনিক অবশেষে মৃত সম্রাটের হস্ত হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ গ্রহণ করিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিল। হস্তোত্তোলন করিয়া হূণরাজ তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে তাহার নাম সুপরিচিত। সেই ব্যক্তি আর্য্যাবর্ত্তের ত্রাণ-কর্ত্তা—যশোধর্ম্মদেব।

বৃদ্ধ প্রভাতে বনমধ্যে পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছিলেন; দেখিলেন, ক্ষত-বিক্ষত দেহে মলিনবেশপরিহিত দীর্ঘাকার এক যোদ্ধা বৃক্ষতলে অচেতন অবস্থায় পতিত। তাহার পার্শ্বে বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত শূল; কিন্তু তাহার দক্ষিণহস্তে গরুড়শীর্ষ সুবর্ণদণ্ড দৃঢ়মুষ্টিনিবদ্ধ রহিয়াছে, চেতনা অপহৃত।

হইলেও যোদ্ধৃবর দণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। জলসেচনে বৃদ্ধ সৈনিকের মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন ধীরে ধীরে বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় বৃদ্ধ অস্ত্রক্ষতগুলি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষা কালে বৃদ্ধ দেখিলেন যে, যোদ্ধার বক্ষোদেশে গভীর ক্ষত হইতে তখনও সামান্য শোণিতস্রাব হইতেছে। জলসেচনে ও রক্তনির্গম স্থগিত হইল না। বৃদ্ধ ঔষধ সংগ্রহার্থ নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অল্পক্ষণ পরেই চর্ব্বিত পত্রের সাহায্যে রক্তস্রাব স্থগিত করিলেন। বৃদ্ধের পুষ্পচয়ন স্থগিত রহিল; বিমলাকীর্ত্তি সূত্র বিস্মৃত হইয়া বৃদ্ধ নবাগতের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সদ্ধর্ম্মীর ধর্ম্মই এইরূপ।

---

[১১]

বৃদ্ধের শুশ্রূষায় সৈনিক ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। উভয়ে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরমধ্যে বাস করিতেন ও পরস্পরের সাহায্যে দিনপাত করিতেন। বৃদ্ধের শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিয়া যুবা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ও নির্জ্জন, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে বৃদ্ধকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি যথাসাধ্য বৃদ্ধের সেবা করিতেন কুটীর মার্জ্জন, পুষ্প ও ফল আহরণ, ভগ্নস্তূপের চতুঃপার্শ্ব মার্জ্জন ইত্যাদি সমুদায় কার্য্যভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসরমত বৃদ্ধ আগন্তুককে প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করাইতেন, তথাগতের কথা, সদ্ধর্ম্মের কথা, প্রাচীন রাজগণের কথা প্রতিদিনই আবৃত্তি করিতেন। বুদ্ধ-কথা শুনিয়া যুবকের চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইত। তরুণ শাক্য-রাজকুমার কিরূপে নাগরিকের দুঃখদর্শনে ব্যথিত হইয়া সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার জীবন ধর্ম্মপ্রচারে ব্যয়িত হইয়াছিল এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে হেমন্তের দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইত। বৃদ্ধ স্তূপগাত্রের ও বেষ্টনীর স্তম্ভসমূহের লেখমালা পাঠ করিয়া স্তূপনির্ম্মাণের কথার কিয়দংশ অবগত হইয়াছিলেন। সময় সময় দুইজনে ধনভূতি ও তাঁহার নাগ-রিকগণের কথাও হইত। বৃদ্ধ প্রিয়দর্শী ও দেবপুত্র কণিষ্ক প্রভৃতি সদ্ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক রাজগণের সম্বন্ধে যাহা জানিতেন আগন্তুককে তাহা শ্রবণ করাইতেন। অভিধর্ম্মের ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাসের কথা যুবক অধিক মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। গুপ্তরাজবংশের আধিপত্যকালে আত্মবিচ্ছেদে ও সাহায্যাভাবে সদ্ধর্ম্মের কিরূপে অবনতি

হইয়াছিল তাহা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আত্মহারা হইয়া যাইতেন; যুবকও অতিশয় মনোযোগের সহিত সে কথা শ্রবণ করিতেন। শকসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর কিরূপে ধীরে ধীরে সদ্ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে তৎকালে বৃদ্ধের সমকক্ষ আর কেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৃদ্ধ, বোধ হয়, আর্য্যাবর্ত্তের নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া সদ্ধর্ম্মের অবনতির কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সদ্ধর্ম্মের শাখাভেদ ও শাখাসমূহের মধ্যে কলহ, হীনযান মহাযানের দ্বন্দ্ব কোন্ বিষয়ে, কোন্ ভূক্তিতে, কোন্ নগরে, কোন সময়ে, কি ভাবে হইয়াছিল, তাহা বৃদ্ধের জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান করিতেছিল। সময় বুঝিয়া কূটবুদ্ধি, ভীরু, কাপুরুষ ব্রাহ্মণগণ কিরূপে ধীরে ধীরে উত্তরাপথের নানাদেশে শীর্ষ উত্তোলন করিতেছিল বৃদ্ধ তাহা অবগত ছিলেন। লিচ্ছবীবংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও সমুদ্র গুপ্ত গোপনে সদ্ধর্ম্মের কতদূর অনিষ্টসাধন করিয়াছিলেন বৃদ্ধ তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতেন। কিরূপে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের সহায়তায় ব্রাহ্মণগণ উত্তরাপথে পুনরায় মুখ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিরূপে ব্রাহ্মণগণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা সত্ত্বেও উত্তরাপথবাসিগণ রাজভয়ে পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের পদানত হইয়াছিল, আত্মবিচ্ছেদে দুর্ব্বল বৌদ্ধসঙ্ঘ কিরূপে ব্রাহ্মণদিগের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় পতিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে করিতে বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেন। অবশেষে কুমার গুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে কিরূপে ব্রাহ্মণগণ রাজবলে বলীয়ান হইয়া আপনাদিগকে ভিক্ষু ও শ্রমণগণের সমকক্ষ বলিয়া পরিচয় দিতেন সে কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নদ্বয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধের সহবাসে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণ্য-

ধর্ম্মাবলম্বী যুবকও ব্রাহ্মণদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। উভয়ে এইরূপে আমাদিগের নিকট দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এক দিন প্রভাতে যুবক বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের বিচ্ছেদের সময় সন্নিকট হইয়াছে; স্থবির শীঘ্রই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ কবিয়া নূতনের অন্বেষণে মহাযাত্রা করিবেন। যুবকের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে দিন আসিল; বৃদ্ধের দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড বহু চেষ্টা করিয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শ্বাস আহরণে অসমর্থ হইল, জীর্ণ পঞ্জর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের সহায়তা করিতে সমর্থ হইল না; ধীরে ধীরে বৃদ্ধের ক্লান্ত দেহ সুষুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিল। যুবক শূন্য হৃদয়ে শূন্য দেহের পার্শ্বে বসিয়া মহাশূন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দিনপাত করিলেন। শূন্য ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বৃদ্ধের লঘুভার দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে জীর্ণ পর্ণকুটীরের জীর্ণ দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া যুবক স্তূপসন্নিধান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাহার পর বহুদিন মনুষ্য দেখি নাই। স্তূপের ধ্বংসাবশেষ লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্মে প্রবল বায়ু জীর্ণ কুটীরের আচ্ছাদনতৃণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, বর্ষার পর বর্ষা আসিয়া কুটীরের প্রাচীন কাষ্ঠদণ্ডগুলিকে প্রাচীনতর করিয়াছে, বসন্তে কুটীরের জীর্ণপঞ্জর শ্যামল তৃণে ও নবীন লতিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, পুনরায় গ্রীষ্মে তৃণ, পত্র, পুষ্প শুষ্ক হইয়া ধূলিতে পরিণত হইয়াছে। স্তূপের যে স্তম্ভগুলি তখনও পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল মনুষ্যহস্তে মার্জ্জনার অভাবে সেগুলি পিচ্ছিল শৈবালময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ে বৃদ্ধের সমাধির উপরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কালক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত বৃক্ষটি দীর্ঘাকার প্রাপ্ত হইলে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূখণ্ড

অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। নিদাঘে দ্বিপ্রহরে নানাবিধ মৃগ আসিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত, ও সন্ধ্যাগমে পুনরায় নিবিড় বনমধ্যে প্রস্থান করিত। তবে বৃক্ষের আকারবৃদ্ধির সহিত আর একটি ঘটনা ঘটিতেছিল, তাহাতে আমাদিগের বিশেষ উপকার হয় নাই। বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাসমূহের ভারে নানাস্থানে দণ্ডায়মান প্রাচীন স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভগুলি ক্রমশঃ পতিত হইতেছিল, বৃক্ষকাণ্ডের স্থূলতাবৃদ্ধির সহিত মূলগুলির সংখ্যা ও অবয়ববৃদ্ধি হইতেছিল এবং তাহার ফলে বহুপ্রাচীন পরিক্রমণের পথের পাষাণখণ্ডগুলি স্থানচ্যুত ও উৎপাটিত হইতেছিল। কতকাল ধরিয়া অশ্বত্থবৃক্ষ ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত ছিল তাহা বলিতে আমি অক্ষম। কিন্তু সে বহুকাল হইবে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মানবের আকার আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। সময়ের প্রারম্ভ হইতে সেই সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম সর্ব্বদা সেই কথাই চিন্তা করিতাম। হরিদ্বর্ণ, শৈবালসমাচ্ছাদিত রক্ত প্রস্তরকণমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বদাই প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা হইত। সকলেই পুনরায় মানবদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া থাকিত। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত, এইরূপ ভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। মানবের চিরপরিচিত পদশব্দ আমাদিগের আর কর্ণগোচর হইল না।

কোন কোনও দিন দ্বিপ্রহরে পিপাসিত মৃগসমূহ জলান্বেষণে আসিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিত, ইহাদিগের পদচিহ্ন বর্ষা ব্যতীত অপর সময়ে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষতলে দৃষ্ট হইত। একদিন প্রভাতে দীর্ঘাকার, ক্ষীণদেহ একটি ব্যাঘ্র বৃক্ষতলে ক্লান্তি দূর করিতেছিল এবং সময়ে সময়ে উৎকর্ণ হইয়া বনমধ্য হইতে আগত পদশব্দ লক্ষ করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে বহু দূরে হস্তিপদশব্দ শ্রুত হইল। সেই পদশব্দ বনবাসী স্বাধীন

করিযূথের আহারান্বেষণে যথেচ্ছ পাদচারণের শব্দ নহে, মনুষ্যকর্ত্তৃক চালিত হস্তীর ধীর—সমভাবে পাদক্ষেপণের শব্দ। শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে শার্দ্দূল অস্থির হইয়া উঠিল। তখন তাহার দ্রুতবেগে পলায়নের ক্ষমতা নাই; অনুমান হইল, বহুক্ষণ হইতে এবং বহুদূর হইতে কেহ যেন তাহাকে তাড়না করিয়া আনিয়াছে। বহু কষ্টে ব্যাঘ্রটি নিকটবর্ত্তী বেতস-কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণকরিল এবং তাহার পরক্ষণেই বনমধ্য হইতে লৌহবর্ম্মা-বৃত একটি বৃহৎ হস্তী নির্গত হইল। তাহার স্কন্ধে হস্তিপক ও পৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে জনৈক বৃদ্ধ ও একটি বালক। আঘ্রাণে ব্যাঘ্রের অবস্থান অবগত হইয়া লৌহমণ্ডিত হস্তী ধীরে ধীরে বেতসবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। বেতস লতার একটি অঙ্গুলি ঈষৎ কম্পিত হইল। অমনই বালকের হস্তনিক্ষিপ্ত শর ব্যাঘ্রের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইল। আর্ত্ত-নাদে বনভূমি বিকম্পিত করিয়া, এক লম্ফে ব্যাঘ্র বেতসকুঞ্জ উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষতলে পতিত হইল, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। হস্তিপক হস্তিকে উপবেশন করিতে আদেশ করিল; কিন্তু বেত্রলতায় আচ্ছাদিত স্তূপবেষ্টনীর ভগ্ন স্তম্ভে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হস্তী উপবেশন করিতে পারিল না,—কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উপবেশন করিল। বৃদ্ধ ও বালক হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মৃত ব্যাঘ্রের নিকঠ গমন করিলেন। উল্লাসে বালক শার্দ্দূলের দীর্ঘদেহ হস্তীর নিকট আনয়ন করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে নিষেধ করিলেন। বালকের উল্লাস প্রশমিত হইল না; ব্যাঘ্রের দেহ লইয়া বালক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। তাহার জীবনে এই প্রথম শার্দ্দূল হনন। সে দেখিতেছিল, তাহার শর ব্যাঘ্রের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়াছে। বৃদ্ধ তখন পশ্চাৎ-পদ হইয়া বেতসকুঞ্জে বারণের পদস্খলনের কারণ অনুসন্ধান করিতে-

ছিলেন। বেতসলতায় আচ্ছাদিত হইয়া প্রাচীন স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভ লুক্কায়িত ছিল। সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ভগ্ন পাষাণের অগ্রভাগ, উপবেশনকালে, হস্তীর পশ্চাৎদেশে বিদ্ধ হওয়ায় যাতনায় হস্তী উপবেশন করিতে পারে নাই। তিনি শূলের দণ্ডে বেতসলতা অপসৃত করিয়া পাষাণখণ্ড দর্শন করিলেন। বৃদ্ধের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় শূলহস্তে বেতসকুঞ্জমধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। হর্ষোৎফুল্ল বালক পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছিল; সে আহ্বান তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। বালক বিরক্ত হইয়া বৃক্ষতল হইতে বেতসকুঞ্জে দৌড়াইয়া আসিল, পিতার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের ভাব দর্শন করিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই ভাবে দিন অতীত হইল। বালক ব্যাঘ্র লইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল, গুরুভার বর্ম্মে পীড়িত হইয়া হস্তীও অসুস্থতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে আলোকের অভাব অনুভব হইলে বৃদ্ধের চিন্তার অবসান হইল। বেতসকুঞ্জ হইতে অশ্বত্থবৃক্ষতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধ হস্তিপককে হস্তীর বর্ম্ম মোচন করিতে আদেশ করিলেন ও তাহার পৃষ্ঠের আস্তরণ বৃক্ষতলে বিস্তৃত করিতে কহিলেন। ইহাতে হস্তিপক বিস্মিত হইল, কিন্তু নীরবে আজ্ঞা পালন করিল। বৃক্ষতলে কঠিন আস্তরণে পিতা ও পুত্র উপবেশন করিলেন। হস্তিপক হস্তী লইয়া জলান্বেষণে গেল। হস্তিপক প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সন্ধ্যাকালে সকলে বনমধ্য হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে চারিটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন ও কাষ্ঠস্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রামের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে হস্তী ও চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মনুষ্যত্রয় রজনী অতিবাহিত করিলেন। নিশাচর মৃগ-

সমূহ রজনীতে জলান্বেষণে আসিয়া অগ্নির ভয়ে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিল না। প্রভাতে হস্তী সজ্জিত করিয়া পিতাপুত্র বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিলেন। তৎপূর্ব্বে দিবালোকে হস্তীকর্ত্তৃক সংগৃহীত ইন্ধন অগ্নিকুণ্ডসমূহের চতুষ্পার্শ্বে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, কুণ্ডচতুষ্টয় সমভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল ও তাহার ধূম বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছিল। অশ্বত্থবৃক্ষের সান্নিধ্য পরিত্যাগকালে পিতাপুত্রে কথোপকথন হইতেছিল যে, অগ্নি সন্ধ্যাকাল অবধি প্রজ্জ্বলিত থাকিবে, অশুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলনহেতু ধূমের স্তম্ভ বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইবে, দূরে নগরে ও শিবিরে বনমধ্যস্থ ধূম দৃষ্ট হইলে লোক আসিবে।

অগ্নিকুণ্ডসমূহ দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল, প্রভাতেও অঙ্গার-রাশি হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া আকাশে পুঞ্জীকৃত হইতেছিল। প্রথম প্রহর অতীত হইলে ধূম লক্ষ্য করিয়া হস্তীর পর হস্তী বহুসংখ্যক মনুষ্য বহন করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসিতে আরম্ভ করিল। কয়েকজন মনুষ্য ব্যাঘ্রের ত্বক্‌ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠে প্রস্থান করিল; কিন্তু অপর সকলে বৃক্ষশাখা ও পত্রের সাহায্যে অশ্বত্থবৃক্ষতলে অগ্নিকর্ত্তৃক পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ চতুষ্পার্শ্বস্থ বেতসকুঞ্জসমূহ ছেদনে সচেষ্ট হইল। সুবর্ণবর্ণ উষ্ণীষ পরিহিত জনৈক যুবক, সম্ভবতঃ কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, অন্যান্য সকলের কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। ক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে শত হস্ত পরিমিতি ভূমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরিষ্কৃত হইল। প্রতিদিন দিবসের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রমজীবিগণ পরিশ্রম করিয়া ধীরে ধীরে স্তূপবেষ্টনীর চতুঃপার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড পরিষ্কৃত করিল, তোরণ ও বেষ্টনীর যে কয়েকটি স্তম্ভ তখনও পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল সেগুলি ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইল। অবশেষে শ্রমজীবিগণ

কণিষ্ককর্ত্তৃক নির্ম্মিত পাষাণাবৃত পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। পাষাণাচ্ছাদিত থাকায় পথে দীর্ঘাকার বৃক্ষাদি জন্মে নাই, তবে স্থানে স্থানে পাষাণ উন্মূলিত করিয়া বৃহৎ অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষসমূহ দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তথাপি বনমধ্যে আসিলে বোধ হইত যে, এই ভীষণ গহনে অতীতে কোন কালে একটি প্রশস্ত বর্ত্ম ছিল। সুতরাং অতি অল্প আয়াসেই কণিষ্ক নির্ম্মিত রাজপথ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। প্রাচীন নগরোপকণ্ঠে প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীর স্রোতের গতিপরিবর্ত্তনহেতু রাজপথ স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কণিষ্কের সময়ে নদীর উপরিভাগে যে স্থানে রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল সে স্থান হইতে নদী বহু দূরে অপসৃত হইয়াছিল; অন্যান্য পার্ব্বত্য নদীর সহিত যুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র নদী বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল; রাজপথের আচ্ছাদনের পাষাণ স্রোতোবেগে উভয় পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; কণিষ্কের নামযুক্ত পাষাণখণ্ডসমূহ নূতন নদীর উভয় তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বালুকাস্তরে প্রোথিত হইয়া শকরাজের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল। নূতন নদীর উপরিভাগে পাষাণনির্ম্মিত নূতন দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইল; কণিষ্কের ক্ষুদ্র সেতু সংস্কৃত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল; নূতন নদীপারে নূতন রাজপথ পুরাতন রাজপথে আসিয়া মিলিত হইল ও পুরাতন রাজপথ উত্তরে প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমে বিদিশা পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইল।

ইহার পর একদিন বৃদ্ধ আসিলেন। শুনিলাম, বৃদ্ধকে সকলে রাজসম্বোধন করিল। শুনিলাম, বৃদ্ধের নাম যশোধর্ম্মদেব; তিনি গান্ধার ও কীর হইতে সমতট ও প্রাগ্জ্যোতিষের অধীশ্বর। আরও শুনিলাম সামান্য সৈনিকপদ হইতে সৌভাগ্যবলে বৃদ্ধ রাজপদবী লাভ করিয়াছেন; প্রাচীন রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছে; কান্যকুব্জে গুপ্তবংশের কেহ নাই;

অনুগাঙ্গপ্রদেশে ও মগধে গুপ্তরাজগণ যশোধর্ম্মদেবের অনুগ্রহপ্রার্থী। বৃদ্ধ আসিয়া একে একে তোরণের সমস্ত স্তম্ভগুলি পরীক্ষা করিয়া শ্রমজীবিগণকে মৃত্তিকা খননে নিযুক্ত করিলেন। বহু শতাব্দী পরে প্রাচীন পরিক্রমণের পথ সূর্য্যালোক দর্শন করিল; ক্রমে স্তূপের অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি নয়নগোচর হইল। ধীরে ধীরে বহুযত্নে শ্রমজীবিগণ পাষাণের উপর পাষাণ রক্ষা করিয়া মণ্ডলাকারে পাষাণসজ্জা করিল। আমি উৎসুকনেত্রে দেখিতেছিলাম; ভরসা করিয়াছিলাম যে, ইহারা গর্ভগৃহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে ও তথাগতের শরীর-নিধান উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু বোধ হয় মনুষ্যলোকে সেকথা বহুদিনলুপ্ত হইয়াছিল। বহুকাল পরে বিদেশীয় যাত্রিদলকে ভণ্ড শ্রমণগণ স্বরচিত উপাখ্যান শ্রবণ করাইত ও বলিত, "কণিষ্ক রাজার তনুত্যাগের দিন ইন্দ্রদেবতা আসিয়া মস্তকে শরীর-নিধান বহন করিয়া তুষিতস্বর্গে লইয়া গিয়াছেন ও ব্রহ্মা তাহার উপর ছত্র ধারণ করিয়া গিয়াছেন।" নিরীহ, ধর্ম্মপ্রাণ, সরলস্বভাব বিদেশীয়গণ শ্রমণগণের মিথ্যাবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সেই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, তোমরাও সেই বৃত্তান্তে আস্থা স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া থাক। আমি যাহা ভরসা করিয়াছিলাম, তাহা হইল না; ক্ষুদ্র বৃহৎ পাষাণখণ্ডসমূহ লইয়া স্তূপ নির্ম্মিত হইল। নির্ম্মাণকালে সর্ব্ববিধ পাষাণ এমন কি ভগ্ন মূর্ত্তিসমূহও স্তূপের উপরিভাগে সজ্জিত হইয়াছিল। কণিষ্কনির্ম্মিত রাজ-পথ আচ্ছাদনের দুই একখণ্ড প্রস্তরও তাহার মধ্যে ছিল। এই নিমিত্তই তোমরা কণিষ্কের নামাঙ্কিত পাষাণ স্তূপের অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার পিণ্ডমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলে। স্তূপ সংস্কৃত হইল বটে, কিন্তু বেষ্টনী বা তোরণ সমূহের সংস্কার হইল না। স্তূপের চারিটি তোরণের সম্মুখে হরিদ্রা

বর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত পিষ্টকাকৃতি চারিটি মন্দির নির্ম্মিত হইল। ক্রমে নানাবিধ মূর্ত্তি নগর হইতে আসিতে লাগিল এবং স্তূপের পার্শ্বে নানা স্থানে ক্ষুদ্র মন্দিরসমূহে স্থাপিত হইতে লাগিল।

শ্রমজীবিগণ বহুদিন সংস্কার ও নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। যশোধর্ম্ম একজন সামান্য পদাতিক সৈন্য ছিলেন; স্কন্দগুপ্তের অধীনে তরুণ বয়সে যুদ্ধব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তরুণসৈনিক বৃদ্ধ সম্রাটের পার্শ্বে থাকিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী হূণযুদ্ধে বহু স্থানে অসমসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শত শত যুদ্ধে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রাণরক্ষা করিয়া অবশেষে প্রতিষ্ঠানের মহা-যুদ্ধে সম্রাট নিহত হইলে তিনি বনবাসে গমন করিয়াছিলেন। তখন বুঝিলাম বৃদ্ধ কে; বেতসকুঞ্জে ভগ্ন পাষাণস্তম্ভ কেন তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল; মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া—একমাত্র পুত্রের আহ্বানে বধির হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কি নিমিত্ত বেতসবনে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন? সেই স্তম্ভপার্শ্বে বৃদ্ধ স্থবির সমাহিত। পর্ণকুটীরের পল্লবিত দণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বেতস লতা কুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল তাহা বৃদ্ধ দর্শনমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জীবনদাতা বৃদ্ধ স্থবিরের কথা সহসা মনে উদিত হইয়া বৃদ্ধকে পাষাণবৎ নিশ্চল করিয়াছিল। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর লোকালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুবক তাঁহার জীবনদাতার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বহুকালপরে—জীবনের শেষ সীমায় দণ্ডায়মান হইয়া রক্তবর্ণ পাষাণের স্তম্ভদর্শনে সম্রাটের মনে পরমোপকারী বৌদ্ধ স্থবিরের কথা পুনরায় উদিত হইয়াছিল। বুঝিলাম, বৃদ্ধ সম্রাট গুরুর আদেশে স্তূপ সংস্কার করিতেছেন, সদ্ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সম্রাট এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কৃতজ্ঞতায়

অনুপ্রাণিত হইয়া সসাগরাধরণীর সম্রাট অজস্র অর্থব্যয়ে ধনভূতির স্তূপ পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছেন। শুনিলাম, সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের বহির্দ্দেশস্থ দেশসমূহ যশোধর্ম্মের বাহুবলে জিত হইয়াছিল, হিমমণ্ডিত উত্তর দেশীয় পর্ব্বতে, বালুকাতপ্ত উত্তরমরুদেশে, খস ও হূণগণ যশোধর্ম্মের ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে। শুনিলাম, আর্য্যাবর্ত্তের হূণাধিকার লুপ্ত হইয়াছে; বহু রক্তপাতে অর্জ্জিত তোরমাণের সাম্রাজ্য তোরমাণের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে; লৌহিত্যতীরে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রক্তপিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্ম্মের নামে: কম্পিত হইয়া থাকে ও গোপনে অন্ধকার রজনীতে পশুহত্যা করিয়া রক্তপিপাসা শান্ত করিয়া থাকে। শুনিলাম, পূর্ব্বসমুদ্রতীরে হরিদ্বর্ণ তালীবনবেষ্টিত মহেন্দ্রগিরিশীর্ষে যশোধর্ম্মের জয়স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে; তুষারমণ্ডিত হিমগিরি হইতে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমি যশোধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে; আর্য্যাবর্ত্তে সমুদ্র গুপ্তের পরবর্ত্তীকালে কেহ আর এতাদৃশ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয় নাই।

---

[১২]

তাহার পরদিন মনুষ্যজাতির প্রতি ও সদ্ধর্ম্মের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানবকে কত ভালবাসি, মনুষ্য-সংসর্গ কত ভালবাসিতাম, আজীবন মানবকরস্পর্শে চালিত করিয়া আসিয়াছি, আজীবন যাহা কিছু নূতন দেখিয়াছি তাহাও মানবের কৃপায়; স্মৃতিশক্তিহীন, চলচ্ছক্তিহীন জীবনে যতটুকু স্থান ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও মানবের জন্য। তাহাই নিশ্চল পাষাণের মানবের প্রতি আকর্ষণের হেতু ও তাহাই আমাদের মানবদর্শনলালসার মূল। মনুষ্য-দর্শন করিবার জন্য উৎসুক চিত্তে বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছি; যখন মনুষ্য-সংসর্গের পরিবর্ত্তে নিবিড়বনবেষ্টিত হইয়া অসংখ্য অগণিত বৎসর যাপন করিয়াছি, তখনও জীবনের একমাত্র লালসা—একমাত্র উদ্দেশ্য—মানবসমাজের সংস্পর্শলাভ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। জীবনে মানবসংস্পর্শের প্রথম দিনে মানবের নগরোপকণ্ঠে আসিয়া যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম, কতদিন তোমাকে বলিয়াছি, সেরূপ সৌন্দর্য্য আর দেখি নাই, আর কখনও দেখিবার আশা নাই। কিন্তু এক দিনে সেই মানবের প্রতি ও মানবসংস্পর্শের প্রতি এরূপ দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, এখনও তাহা প্রশমিত হয় নাই। মানবের প্রারম্ভ হইতে মানবকে দেখিতেছি, মানবকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, মানবকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, এখন ঘৃণা ও শ্রদ্ধা অতিক্রম করিয়া মানবকে দেখিতেছি; কিন্তু যশোধর্ম্মদেবের স্তূপার্চ্চনার দিন মানবের যে রূপ দেখিয়াছি সে রূপ আর কখনও আমাদিগের গোচর হয় নাই। মানবের প্রারম্ভ দেখিয়াছি, বলবীর্য্যসম্পন্ন, দীর্ঘাবয়ব, সরলচিত্ত, আর তখন

দেখিয়াছি বলহীন, ক্ষীণ, ক্ষুদ্রদেহ, ক্ষুদ্রচেতা কুটিলমতি মানব। তাহাদিগকে দেখিয়া মনে স্বতঃই ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, অধঃপতনের শেষ সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ মুহূর্ত্তের জন্য আত্মরক্ষার চিন্তা করে নাই। তখন জগতে কোন প্রকার উত্তেজনাই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে পারিত না। শাক্যের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম তাহাদিগের নিকট সমান হইয়াছে; উন্নতির চেষ্টা বহুদিন শেষ হইয়াছে; তখন ধর্ম্মের নাম স্বার্থসাধন, সঙ্ঘের নাম কামাচার ও বুদ্ধের নাম বিশ্বাসঘাতকতা; তখন ব্রাহ্মণের ইজ্যার নাম অর্থশোষণ, অধ্যয়নের নাম স্বার্থসাধন ও দানের নাম পরস্বাপহরণ হইয়াছে। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, নিঃশব্দে জগতকে জানিতে না দিয়া, ধীমান ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন সরল ধর্ম্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার তাঁহাদিগেরই বংশধরগণ স্বার্থসাধনের জন্য দৃঢ় ভিত্তি ক্ষয় করিয়া ভবিষ্যৎ বিনাশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; দেখিতে পাইবে, এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নাই, ধীরে ধীরে মিথ্যার গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে,—সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্ধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূরীভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সহিত আর্য্যাবর্ত্তের কি দশা হইয়াছে? সত্য আবহমানকাল সত্যই রহিয়াছে, কখনও দীর্ঘকাল মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত থাকে নাই। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সদ্ধর্ম্মের ছায়ামাত্র বর্ত্তমান আছে, শাক্যরাজকুমারের সরল বিশ্বাসের ধর্ম্ম অতীতে বর্ত্তমান নাই। যাহা আছে, তাহা কি সদ্ধর্ম্ম? তথাগতের মহাপরিনির্ব্বাণের পর যে সকল মহাস্থবির সেই সুসমাচার জগতে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে কি সদ্ধর্ম্মের নামে প্রচলিত ছায়া চিনিতে পারিবেন? নিজ মনে অন্বেষণ

করিয়া দেখ, যাহাকে আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্ম বলিত, তাহা নাই, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা আছে তাহা তোমরা চিনিতে পারিবে না। স্বেচ্ছাচারীর অদম্য কাম ও অসহ্য লালসা সদ্ধর্ম্মের সহিত দেশে ও বিদেশে যাহা মিশ্রিত করিয়াছে তাহাতে সদ্ধর্ম্মে সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য প্রবেশ করিয়াছে। যাহা সত্য, তাহা সরল ও সহজবোধগম্য, এক সত্যের সাহায্যে অপরের সাহায্য লাভ করা যায়, তাহা স্থায়ী হয়। কিন্তু একবার যদি অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তদ্ব্যতীত আর পন্থা থাকে না; একটি মিথ্যা কথা প্রমাণ করিতে হইলে যেমন শত শত মিথ্যা কথার অবতরণা করিতে হয়, সত্যের সহিত অসত্য মিশ্রিত হইলে তেমনই অসত্যেরই প্রাদুর্ভাব হয়, সত্য দূরীভূত হইয়া যায়। চাহিয়া দেখ কি হইয়াছে, উত্তরমেরুপ্রান্তে চিরতুষারমণ্ডিত সমুদ্রকূলবাসী অসভ্য বর্ব্বরগণও সদ্ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের সদ্ধর্ম্ম কিরূপ? তাহাদিগের শ্রমণগণ দন্তহীন মৎস্যের পূজায় দিবস অতিবাহিত করিয়া থাকে ও সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া রজনীযাপন করে। দূরে যাও, মেরুবাসী মৎস্যভুক বামনগণও সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী, তাহাদিগেরও শ্রমণ আছে, তাহারা মৎস্যের আকাঙ্ক্ষায় সমুদ্রের পূজা করিয়া থাকে, বহু শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম্ম, বুদ্ধ বা সঙ্ঘের নাম শ্রবণ করে নাই। উত্তরকুরুর সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তে যে সুসভ্য জাতি বাস করে তাহারাও বৌদ্ধ; তাহাদের ভিক্ষু ও শ্রমণগণ কাষায় পরিধান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের শত শত বিহার ও সঙ্ঘারাম আছে; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিও, তাহাদিগের মধ্যে কয়জন গৌতমবুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াছে। তাহাদিগের ভিক্ষুগণ দারপরিগ্রহ করিয়া সঙ্ঘারামে গৃহস্থাশ্রম স্থাপিত করিয়াছে, হলকর্ষণ বা বাণিজ্য তাহাদিগের নিকট দোষাবহ নহে।

আর্য্যাবর্ত্তের নিকটে আগমন কর ; চাহিয়া দেখ, আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্তে কি হইতেছে! সদ্ধর্ম্ম আছে, বুদ্ধ আছে, কিন্তু সার বস্তুর অভাব। এক বুদ্ধের স্থানে চতুর্বিংশতি সহস্র বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে; ধ্যানীবুদ্ধ, মানসীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণপরিবৃত অন্তসারশূন্য গৌতম বুদ্ধের নাম এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। শত শত শক্তিপরিবেষ্টিত বোধিসত্ত্বগণ সর্ব্বদাই বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়লালসাপরিতৃপ্তি ব্যতীত নির্ব্বাণলাভের উপায় নাই। বিত্তশালী সঙ্ঘারামসমূহে সুরার সহিত শক্তির উপাসনা ব্যতীত অপর কোন কথা শুনিতে পাইবে না। যে সুবর্ণভূমি হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই সুবর্ণভূমিতে সদ্ধর্ম্মের কি অবস্থা হইয়াছে পরীক্ষা করিয়া দেখ! সুবর্ণব্রীহিমণ্ডিত কাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতি দিন বসালিপ্ত অন্নসংস্থাপন করাই বৌদ্ধের একমাত্র কর্ম্ম। প্রব্রজ্যা গ্রহণের নাম এখনও বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহা নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। শিশুগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, প্রভাতে চীরধারণ করে ও সন্ধ্যাকালে তাহা দূরে নিক্ষেপ করে, ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিয়াছ? সদ্ধর্ম্মে যখন অবনতির সূত্রপাত হইল, তখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘ উন্নতির কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন? তাঁহারা দেখিলেন, রাজশ্রীর আশ্রয় লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মমতে কালানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতেছেন, তদনুকরণে তাঁহারাও তথাগতের সরল ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে শাক্যরাজকুমারের সরল ধর্ম্মের সহজাত মাধুর্য্য নষ্ট হইল। যে আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া জনসমাজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর ও বাক্যমালা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তথাগতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে, আসিত তাহা আর রহিল না। তখন আকর্ষণ করিবার নূতন উপায় আবশ্যক হইল, সদ্ধর্ম্মে

সরল বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বাহ্যাড়ম্বর সার হইল। বহুদিন হইতে বাহ্যাড়ম্বরে ব্রাহ্মণগণ অভ্যস্ত, জনসমাজও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আড়ম্বর দেখিতে অভ্যস্ত। অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরে বৌদ্ধসঙ্ঘ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। বৌদ্ধসঙ্ঘের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল ও পদস্খলন আরব্ধ হইল। অবনতির চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া শান্তিময় মহাজিনের শান্তিময় ধর্ম্ম নিরীহ আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের রক্তস্রোতে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে তাড়িত হইল। নিরীহ সদ্ধর্ম্মে প্রকৃতবিশ্বাসী জনসমূহের রক্তস্রোতে সদ্ধর্ম্মের নাম দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক উপত্যকা হইতে ধৌত হইল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া, তাহারা অনন্তের শেষ পর্য্যন্ত দুর্জ্জেয় থাকিবে। কিন্তু যাহা কখনও হয় নাই তাহা তখনও হইল না। প্রসার বিহীন ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গিরিদুর্গ জিত হইয়াছে —সংস্কার দূর হইয়াছে,—নাম বর্ত্তমান আছে; সার অপহৃত হইয়াছে, ছায়া এখনও অপসৃত হয় নাই। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেছি; দেখিতেছি, যাহা আছে তাহাও থাকিবে না; কারণ, জগতে অসত্যের স্থান নাই।

যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাহার নাম যথেচ্ছাচার ও সুশৃঙ্খলার অভাব। তাহা দেখিলে বোধ হয়, যাহারা এ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহারা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইবে। দশপুর হইতে সেনা আসিয়াছে। তাহাদিগের অধিনায়কবর্গ, অস্ত্রশস্ত্র, অনুচর, পার্শ্বচর প্রভৃতি সমস্তই উপস্থিত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে সুশাসন বা সুশৃঙ্খলার একান্ত অভাব। সেনা আসিবার পূর্ব্বে বহুসহস্র পটমণ্ডপ আসিয়াছে; কিন্তু শৃঙ্খলার অভাবে শিবির স্থাপনের আদেশ হয় নাই, সুতরাং শিবির স্থাপিত হয় নাই। দিবাবসানে শ্রান্ত সেনাদল

আসিয়া যে স্থানে আশ্রয় দেখিল সেই স্থানেই অধিবাসিগণকে নিষ্কাশিত করিয়া তাহা অধিকার করিল। ভিক্ষু ও শ্রমণগণ আশ্রয়বিহীন হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন, কিন্তু সৈনিকগণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। রাত্রি অতিবাহিত হইলে পটমণ্ডপ স্থাপিত হইল, সেনাদল শিবিরে চলিয়া গেল, কুটীর ও গৃহসমূহের অধিবাসিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্রমে প্রাচীন স্তূপের বেষ্টনীর বহির্ভাগে কতকগুলি বিপণী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আহার্য্য, বস্ত্রাদি ও সুরা বিক্রীত হইয়াছে। বিপণীর চতুষ্পার্শ্বে সেনাদলের পার্শ্বচারিণীদিগের পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। বিপণী হইতে কলসের পর কলস সুরা এই কুটীরসমূহমধ্যে আনীত হইতেছে; কিন্তু বিক্রেতা সকলের নিকট মূল্য পাইতেছে না। পুরাতন পাষাণখণ্ড-সমূহে নির্ম্মিত নূতন সঙ্ঘারামে ভিক্ষুগণ কাষায়ের পরিবর্ত্তে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। সঙ্ঘারামেও ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ আকারের মৃন্ময় কলস আনীত হইতেছে, ভিক্ষু ও শ্রমণগণ সাধনার জন্য আবশ্যকানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের মধু আনয়ন করিতে অনুচরবর্গকে আদেশ প্রদান করিতেছেন। বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের কলসের মুখে পুষ্প বা ফলের আচ্ছাদন রহিয়াছে, কোন কলসের মুখে কদম্ব বা যবশীর্ষ, কোন কলসের মুখে প্রফুল্ল কমল বা মধূপপুষ্প, কাহারও মুখে আম্রশাখা এবং কাহারও মুখে বা পক্ক কদলী। রজনীসমাগমে মধুর প্রয়োজনের আধিক্য হইত, বরবর্ণিনী শক্তিগণের সাহায্যে সদ্ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কলস কলস মধু প্রতি রজনীতে যথাস্থানে প্রেরিত ও উপস্থিত হইত। বুদ্ধ বা বোধি-সত্ত্বগণের নাম করিলেই হইত। সময়ে সময়ে তাহার আবশ্যকও হইত না, সঙ্ঘারামবাসী অনেকেই বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বনামে অভিহিত হইতেন।

নিশীথে সঙ্ঘারাম হইতে নৃত্য ও গীতের শব্দ উথিত হইয়া প্রাচীন পাষাণ সমূহের মনে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদিত করিত। কখনও কখনও মহাশক্তিগণ বুদ্ধবোধিসত্ত্বাদির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সৈনিকগণের আশ্রয় গ্রহণ করিত। তখন শক্তির অধিকারের জন্য সৈনিকে ও ভিক্ষুতে ভীষণ কলহ হইত ও সময়ে সময়ে সঙ্ঘারামবাসী ও শিবিরবাসিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র রণাভিনয়ও হইয়া যাইত। সেনাদলের পার্শ্বচারিণীরাও যে সময়ে সময়ে সঙ্ঘারামে আশ্রয় লাভ না করিত তাহাও নহে। সদ্ধর্ম্মের এমনই মহিমা যে, সঙ্ঘারামমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারাও আচারপরিবর্ত্তন করিয়া মহাশক্তিরূপ ধারণ করিত।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল, স্তূপ ও বর্ত্মসংস্কার, এবং মন্দিরাদিনির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে শুনিলাম, সম্রাট তীর্থদর্শনে আসিবেন ও তাঁহার সহিত নানা দিগ্দেশ হইতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও স্থবিরগণ আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের বাসস্থানসমূহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এক দিন বহু দূর হইতে বহু যানবাহন নূতন বুদ্ধ, নূতন বোধিসত্ত্ব ও শক্তিরূপিণী শত শত নারী বহন করিয়া স্তূপসন্নিধানে উপস্থিত হইল। ক্রমে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র নগর স্থাপিত হইল, শত শত বিপণীতে নগরোপকণ্ঠ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। প্রতি রজনীতে সদ্ধর্ম্মানুযায়ী সাধনার আনন্দধ্বনি বহুদূর হইতে শ্রুত হইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কখনও কোনও গৃহস্থ নাগরিক স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে তীর্থদর্শনে আসিত না। একদিন সম্রাট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত বহুসংখ্যক সৈন্য আসিল, বহুকাল পরে চীরধারী কয়েকজন ভিক্ষু সম্রাটের পার্শ্বচররূপে স্তূপসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের সহিত যে সমস্ত সেনা আসিয়াছিল তাহারা হূণযুদ্ধে সুশিক্ষিত, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে নিয়ম বা শৃঙ্খলার বিশেষ

অভাব ছিল না। সম্রাটের সহিত যে কয়জন চীরধারী ভিক্ষু আসিয়াছিলেন তাঁহারা সমাগত বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের সংস্পর্শে আসিতেন না, দূরে বনমধ্যে পর্ণকুটীরে দিনযাপন করিতেন। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণ ইহাঁদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। একদিন শুনিলাম, সম্রাট পার্শ্বচরগণ পরিবৃত হইয়া উপাসনার জন্য স্তূপে আসিবেন। স্তূপ ও বেষ্টনী পরিষ্কৃত হইল; সজ্জারও অভাব হইল না। শুনিলাম, সেই দিন উপাসনার জন্য নাগরিকগণও স্তূপসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু উৎসব দর্শনে আমাদিগের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

নূতন উৎসবে বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু তথাপি আমরা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হই নাই! যে দিন সম্রাট স্তূপার্চ্চনা করিতে আসিলেন সে দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমণ্ডলী স্তূপ ও বেষ্টনী অধিকার করিয়া বসিলেন। নানা স্থানে শক্তিমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া ভূতলে নানাবর্ণে রঞ্জিত চক্রাঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে উষাকাল হইতে ইঁহারা সম্রাটের দর্শনলাভেচ্ছায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দলে দলে পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে নাগরিকগণ স্তূপসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রিকাল হইতে সশস্ত্র সৈনিকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পথ রক্ষা করিতেছিল। নাগরিকগণ যথাবিধি স্তূপার্চ্চনা ও বেষ্টনী পরিক্রমণ করিয়া পরে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণেরও অর্চ্চনা করিতেছিলেন। স্তূপার্চ্চনাকালে মন্ত্রপাঠের পর ভিক্ষুগণ বা তাঁহাদিগের শিষ্যমণ্ডলী নাগরিকদিগের নিকট হইতে যথাসম্ভব অর্থাকর্ষণ করিতেছিলেন, জীবিত বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণ অর্চ্চিত হইবার পর স্বয়ং দক্ষিণা গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পার্শ্বচারিণী শক্তিসমূহও যথাসম্ভব উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মধুবিহ্বলা শক্তিরূপিণী অনৈকা মহিলা দারুণ তৃষ্ণা

জানাইয়া জনৈক তরুণ নাগরিকের নিকট হইতে এক কলস মধুর মূল্য প্রার্থনা করিতেছিলেন ; তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক সৈনিক তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিতেছিল। মহাশক্তির তৎকালীন অধিকারী চক্রমধ্যে অবস্থিত বোধিসত্ত্বপ্রবরের সহিষ্ণুতা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল ; তিনি ত্রিমূর্ত্তির প্রতি ঘন ঘন রোষকটাক্ষ ক্ষেপণ করিতেছিলেন। দূরে দাঁড়াইয়া কতকগুলি নাগরিক ও নাগরিকা এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করিতেছিল। কোন স্থানে প্রত্যেকবুদ্ধ ও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রাপ্ত দক্ষিণার বিভাগ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল ও কয়েকজন প্রৌঢ় নাগরিক বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিলেন। যে সকল নাগরিকের সহিত তরুণী ও যুবতী মহিলাগণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা সত্বর পূজা সমাপন করিয়া বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সেনাধ্যক্ষ স্তূপাভিমুখে আসিবার ও পরিক্রমণের পথ রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন কোন সৈনিককে স্থানান্তরিত করিতে হইতেছিল। কোন কোন শক্তিরূপিনী মহিলা নাগরিকগণের আকর্ষণে তাঁহাদিগের অধিকারী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণকে পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন ; কিন্তু সম্রাটের সুবর্ণখণ্ডের আশায় চক্র পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে সম্রাটের অনুযাত্রী কয়েকজন সৈন্য পরিবৃত হইয়া কাষায়ধারী নবাগত ভিক্ষুগণ সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। জনৈকা শক্তি আনিয়া ইঁহাদিগকে মধু পান করিতে আহ্বান করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ মধুভাণ্ড প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি অতি ভদ্র ও শ্লীল ভাষায় ভিক্ষুগণের বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার অধিকারী বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের আদেশে তাঁহার শিষ্য ও

অনুচরমণ্ডলী বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে আসিয়া ভিক্ষুগণের সহিত মল্লযুদ্ধের উদ্যম করিল। কোলাহল শুনিয়া রাজপুরুষগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সৈনিকগণের সাহায্যে মহিলা ও তাঁহার অনুচরদিগকে দূর করিয়া দিলেন। চক্রমধ্যে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ররূপ দুর্গমধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না ও ক্রমে শান্তি সংস্থাপিত হইল। বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে পূর্ণ মাত্রায় উৎসব চলিতেছিল; শিষ্যমণ্ডলী ও মহাশক্তিগণ শৌণ্ডিকগণের বিপণী হইতে অনবরত মধুর কলস স্তূপমধ্যে বহন করিতেছিলেন, কখন কখনও নাগরিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য বিপণীমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রন্ধন ও বিশ্রামের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী প্রতীহার ও রক্ষীদল শান্তিরক্ষা করিতেছিল; ভিক্ষু বা শক্তিগণকে তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিতে দিতেছিল না।

প্রথম প্রহর অতীত হইলে সম্রাট স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; শৃঙ্গ ও তূর্য্যনিনাদে জনসঙ্ঘ বধির হইল, ক্ষণেকের জন্য উৎসবস্রোত রুদ্ধ হইল। সৈনিকগণ জনস্রোত রুদ্ধ করিয়া পথ পরিষ্কার করিল; শ্বেত কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত সম্রাট ও যুবরাজ বেষ্টনীর দ্বারে উপনীত হইলেন, নতজানু হইয়া কাষায়পরিহিত ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন তাঁহারা পুরোবর্ত্তী হইয়া বেষ্টনীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রাচীন রীতি অনুসারে স্তূপার্চ্চন ও পরিক্রমণ সমাপ্ত হইলে সম্রাট-বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইয়া ভিক্ষুগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। অর্চ্চনা শেষ হইলে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ দেখিলেন যে, নবাগত ভিক্ষুগণ দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন না। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, স্তূপার্চ্চনা শেষ হইলে সম্রাট নাগরিকগণের ন্যায় তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা করিবেন। সম্রাট বেষ্টনী

পরিত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া অনেকেই চক্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভাণ্ডাগারিক ইন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত সম্রাটের নামাঙ্কিত নূতন সুবর্ণমুদ্রা বিতরণে প্রবৃত্ত হইলে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ চক্র পরিত্যাগ করিয়া ভাণ্ডাগারিককে বেষ্টন করিলেন। সুবর্ণের নাম শ্রবণে মধুভাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও শক্তিগণ শৌণ্ডিকবীথি হইতে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নাগরিকগণ ব্যাপার দেখিয়া দূরে অপসরণ করিল। বহু কষ্টে সৈনিকগণের সাহায্যে সুবর্ণ-বণ্টন আরব্ধ হইল। মর্য্যাদা অনুসারে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব, শক্তি, ভিক্ষু ও শিষ্যমণ্ডলীকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তৃতীয় প্রহরে কার্য্য শেষ হইল। তখন জনৈক বুদ্ধ কোন মধুবিহ্বলা বিবস্ত্রা তরুণী শক্তিকে শৌণ্ডিকালয় হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতেছিলেন। মধুপানের আধিক্যপ্রযুক্ত সুবর্ণের লোভ সম্বরণ করায় বুদ্ধ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত ইঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই বেষ্টনী হইতে প্রস্থান করিলেন। অপরাহ্নে জনসঙ্ঘ স্তূপাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সন্ধ্যাগমে প্রাচীন রীতি অনুসারে স্তূপ ও বেষ্টনী আলোকমালায় সজ্জিত হইল, নাগরিক ও নাগরিকাগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও শক্তিগণ যথাসাধ্য সজ্জা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিলেন। তখন প্রতীহার ও নগররক্ষিগণ পথ রক্ষা করিতেছিল। প্রথম প্রহর অতীত হইলে উৎসবস্রোত মন্দীভূত হইল। শ্রুত হইল, জনৈক বুদ্ধ কোন তরুণী নাগরিকার অঙ্গে হস্তক্ষেপণের জন্য তাহার স্বামী কর্ত্তৃক আহত হইয়াছেন; একজন বোধিসত্ত্ব জনৈক নাগরিকের কন্যাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়া রজনীর অন্ধকারে প্রস্থান করিয়াছেন, রক্ষিগণ তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে নির্গত

হইয়াছে ; কয়েকজন ভিক্ষু বেষ্টনীর মধ্যে অর্থাপহরণ করায় মহাপ্রতীহার কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে ; কয়েকজন ভিক্ষু, শক্তি ও শিষ্য বিপণী হইতে বিনামূল্যে দ্রব্য গ্রহণ করায় মহাপ্রতীহার কর্ত্তৃক চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে নগরে প্রেরণ করিতে হইবে ও দণ্ডপাশিক ও দণ্ডনায়কগণ কর্ত্তৃক ইহাদিগের বিচার হইবে। কতকগুলি মহিলা সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া নাগরিকগণের আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদিগের অধিকারী বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধগণ মহাপ্রতীহারের নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে বেষ্টনী জনশূন্য হইল, তথনও আসব বিক্রেতাদল পণ্যশালা বন্ধ করে নাই, ভিক্ষুগণ মধুর সাহায্যে নির্ব্বাণের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন ; চলচ্ছক্তিহীন স্ত্রী ও পুরুষগণকে রক্ষিদল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, কাহাকেও বা নাগরিকগণ পদাঘাত করিতেছে। রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে দীপসমূহ নির্ব্বাপিত হইল তখন রাক্ষদল ব্যতীত অপর সকলে স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রত্যূষে সম্রাট ও যুবরাজ, অতি অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া, শিবির পরিত্যাগ করিলেন। উৎসব শেষ হইল।

[১৩]

যশোধর্ম্মদেবের বিশাল সাম্রাজ্য জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, উত্তরাপথে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই ; রেবাকণ্ঠ হইতে লৌহিত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর স্বীয় অনুজকে স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। যশোধর্ম্মের মৃত্যুর সহিত আর্য্যাবর্ত্তে দশপুরের রাজবংশের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন গুপ্তবংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নিত্যই নূতন রাজ্য গঠিত ও অচিরে বিলুপ্ত হইতেছিল। যশোধর্ম্মের মৃত্যুর সহিত ক্ষুদ্র সঙ্ঘারামের সৌভাগ্যসূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছিল। যতদিন সম্রাট জীবিত ছিলেন ততদিন ত্রাণকর্ত্তা বৃদ্ধ স্থবিরকে স্মরণ করিয়া স্তূপ ও সঙ্ঘারামের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, ততদিন সঙ্ঘারামের অধিবাসীর অভাব হয় নাই। অর্থলোলুপ, সঙ্কীর্ণচেতা, পশুবৃত্তি অনুসরণকারী বোধিসত্ত্ব ও শক্তিগণের আবির্ভাবে ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পরে যখন আর্দ্র বালুকানির্ম্মিত কন্দুকের ন্যায় সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি বন্ধনহীন হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল তখন বোধিসত্ত্ব ও শক্তিমণ্ডলী সুখের দিন অতীত দেখিয়া স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল। আটবিক প্রদেশ তখন জনাকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। দূরে আভীরগণ একখানি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিল ; নির্ভয়হৃদয়ে অসিতবরণী আভীরবালিকাগণ ধনভূতির নগরশিরে মহিষচারণ করিত। সঙ্ঘারাম জনশূন্য হইলে গ্রাম হইতে আভীর রমণীগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া স্তূপ ও সঙ্ঘারাম মার্জ্জনা করিত, বনজাত পুষ্পমালায় আমাদিগকে সজ্জিত করিত এবং রজনীতে অসংখ্য ঘৃতপ্রদীপদানে আমাদিগের নিকট হইতে অন্ধকারকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত, আভীর যুবকগণ আসিয়া আমা-

দিগকে অরণ্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিত, বংশদণ্ড ও কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে জীর্ণ সঙ্ঘারামের সংস্কার করিত এবং সময়ে সময়ে সঙ্ঘারামের প্রাঙ্গণে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া গ্রামবৃদ্ধগণের নিকটে বোধিসত্ত্বগণের অসীম প্রভাব এবং যাদুবিদ্যায় তাহাদিগের অসাধারণ পারদর্শিতা সম্বন্ধে অত্যদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইত। কখন কখন দুই একজন কাষায়পরিহিত ভিক্ষু দুরদেশ হইতে তীর্থভ্রমণে আসিতেন, বহু পরিশ্রমে বনপথ অতিক্রম করিয়া আমাদিগের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। আভীর রমণীগণ যথাসাধ্য তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। তাঁহারা গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রচলিত প্রাচীন প্রথানুসারে স্তূপ অর্চ্চন, পরিক্রমণ ইত্যাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া পুনরায় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন। এইরূপে কত দিন কাটিয়াছিল তাহা যদি নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিত না। দীর্ঘ দিবস, মাস, বর্ষ আমরা বনচারী আভীরগণের উপাস্য দেবতা হইয়াছিলাম, সঙ্ঘারাম ক্রমে মৃৎস্তূপে পরিণত হইল, পরিক্রমণের পথ শ্যামল দুর্ব্বাদলে আচ্ছন্ন হইল, হরিদ্বর্ণ শৈবালে আমার লোহিত দেহ আবৃত হইয়া গেল, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কেহ আর আমাদিগকে সন্ধান করিতে আসিল না।

এক দিন আভীর পল্লীতে নূতন সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ভিক্ষু আসিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ গৈরিকবর্ণরঞ্জিত, কেশপাশ দীর্ঘ জটায় পরিণত, সমগ্র দেহ ভস্মলিপ্ত এবং তাহার হস্তে ত্রিশূল। পল্লীর বালকবালিকাগণ তাহাকে দেখিলে দূরে পলায়ন করিত; কিন্তু আভীর বৃদ্ধগণ তাহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। এই নূতন ভিক্ষু মাসাধিককাল আভীরগ্রামে বাস করিয়াছিল। সে প্রতিদিন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুদূর পর্য্যটন করিত। সে বনভ্রমণকালে একে একে প্রাচীন আটবিকদেশের

সমস্ত ধ্বংসাবশেষই লক্ষ্য করিয়া দেখিল। সে ধনভূতির নগর, স্তূপ ও সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল। ইহার পর কিছুকাল নূতন ভিক্ষু স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তখন মধ্যাহ্নে আভীর রমণীগণ আমার ছায়ায় বসিয়া বলিত, "সন্ন্যাসী আপনার দল আনয়ন করিতে মধ্যদেশে গমন করিয়াছে, শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

বস্তুতঃ শৈব সন্ন্যাসী প্রায় তিন মাসকাল পরে অন্যূন পঞ্চাশৎজন অল্প-বয়স্ক সন্ন্যাসী লইয়া পুনরাগমন করিল। নবাগত ভিক্ষু সম্প্রদায় ধনভূতির নগরের ধ্বংসাবশেষের সর্ব্বোচ্চস্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। প্রথম যে সন্ন্যাসী আভীর-গ্রামে আসিয়াছিল সেই ব্যক্তিই নূতন সঙ্ঘারামের মহাস্থবির হইয়াছিল। ইহারা সঙ্ঘারামকে মঠ বলিত, মহাস্থবিরকে মঠাধীশ বা মঠাধিপ বলিত এবং রাজার ন্যায় সম্মান করিত। বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুগণের ন্যায় স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা এই নূতন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত না। ইহারা সর্ব্বদাই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও উপাসনায় মগ্ন থাকিত, কঠোর আত্মসংযমে জীবন অতিবাহিত করিত, জ্যেষ্ঠ ও স্থবিরগণকে পিতৃতুল্য বোধে সম্মান করিত এবং স্ত্রী-জাতিকে কালব্যাল জ্ঞানে দূর হইতে পরিহার করিত।

আভীরগণের সাহায্যে স্তূপ ও সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাষাণ সংগ্রহ করিয়া স্তূপের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে সন্ন্যাসিগণ কয়েকটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে প্রাচীন স্তূপের ধ্বংসাবশিষ্টের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তোমরা তাহার ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিলে। সন্ন্যাসিগণ সেই গৃহে পূজা করিতেন। পল্লীবাসী আভীরগণের উপহার ও বনজাত ফলমূল তাঁহাদিগের জীবন ধারণের উপায় হইয়াছিল। সন্ন্যাসি-গণ অবসরমত বনপর্য্যটন করিতেন। তখন আটবিক প্রদেশে সহস্র

সহস্র বর্ষব্যাপী শত শত বিপ্লবে আর্য্য উপনিবেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, জনসঙ্কুল প্রদেশসমূহ অরণ্যসঙ্কুল হইয়াছিল, শত শত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কালক্রমে অনার্য্যবংশসম্ভূত বর্ব্বর জাতিসমূহ এই বনময় রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সন্ন্যাসিগণ ভীষণ অরণ্যমধ্যে নির্ভয়হৃদয়ে ভ্রমণ করিতেন, আভীরগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া বর্ব্বরগণকে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদিগের পবিত্রতা, সংযম, নিষ্ঠা ও শিক্ষা সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে ভক্তিভাজন ও আদরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। মৃগয়াজীবী গোখাদক আভীর পশুহত্যা পরিত্যাগ করিয়া গোপালের সাহায্যে ভূমি-কর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পশুচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিয়াছিল, সচ্ছলতার সময়ে অস্বাভাবিক পানাহার ও অভাবের সময়ে অনশন পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছিল। সন্ন্যাসিগণের উদ্যমে আটবিক প্রদেশে মুদ্রার প্রচলন, বিপণী স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল, আটবিক প্রদেশে ক্রমশঃ সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। উত্তরাপথের রাজগণের সমবেত চেষ্টায় যাহা সফল হয় নাই মুষ্টিমেয় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর চেষ্টায় তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। আটবিক প্রদেশের অধিবাসিগণের বর্ব্বর নামও এই সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়াছিল। পূর্ব্বে উত্তর বা দক্ষিণ হইতে তীর্থযাত্রিগণ প্রাণভয়ে প্রাচীন স্তূপে আসিত না; সুদীর্ঘ বনপথ অতিক্রমকালে বর্ব্বরগণ যাত্রিগণের ধনলুণ্ঠন ও জীবননাশ করিয়া পথচারণ অতি বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু যেমন সময় অতিবাহিত হইতেছিল। তেমনই বর্ব্বরগণ প্রাচীন আর্য্য সভ্যতায় দীক্ষিত হইতেছিল যাহারা বন্য মৃগ হনন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগের প্রজা সন্ন্যাসিগণের

নিকট শিক্ষিত হইয়া হলকর্ষণ ও বাণিজ্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে আর নরহত্যা বা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। আটবিক প্রদেশ ক্রমে পুনরায় জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল; উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ হইতে নির্ভয়ে স্বার্থবাহগণ অশ্ব, উষ্ট্র ও খরপৃষ্ঠে পণ্যভার ন্যস্ত করিয়া আটবিক প্রদেশ অতিক্রম করিত। মগধ হইতে, মধ্যদেশ হইতে, পঞ্চনদ হইতে বণিক্‌গণ বনজাত পণ্যের লোভে বনময় প্রদেশে আগমন করিত। ক্রমে আটবিক প্রদেশ নামমাত্র থাকিয়া গেল। বিন্ধ্যশিখর ব্যতীত দেশের কোন স্থানে অরণ্যানী পরিলক্ষিত হইত না। সন্ন্যাসিগণ চীর ধারণ করিয়া ও ভগ্ন উপলখণ্ডনির্ম্মিত গৃহে বাস করিয়া এই বিস্তৃত রাজত্ব শাসন করিতেন। আটবিকপ্রদেশে রাজা প্রজা ছিল না, কিন্তু রাজশক্তির অভাবে কখনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই। ছিন্ন গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসিগণের অঙ্গুলি-হেলনে বিশাল জন-সঙ্ঘ পরিচালিত হইত। মঠে অধ্যক্ষের পর অধ্যক্ষ আটবিক প্রদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দেহান্তে মঠবাসিগণ আমাদিগের প্রাচীন স্তূপের পরিক্রমণের পথে আচ্ছাদনীয় পাষাণগুলি উত্তোলিত করিয়া তাঁহাদিগের দেহ সমাহিত করিত। কোন মঠাধীশের পরমায়ু শেষ হইলে বিন্ধ্যাদ্রি হইতে সহ্যাদ্রি পর্য্যন্ত রোদনশব্দ শ্রুত হইত; দেশে সমস্ত কার্য্য স্থগিত হইত, জনসঙ্ঘ শোকে মগ্ন হইত।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে যে সমস্ত রাজবংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ অপহরণ করিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাদিগের অধঃপতন আরব্ধ হইল। বহুদূরে প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্রে স্থানীশ্বরের গৌরব-রবি উদিত হইতেছিল। তখনও সম্রাট নাম গ্রহণ করিয়া গুপ্তবংশীয় একজন রাজা মগধ শাসন করিতেছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন পঞ্চনদে হূণ-

প্রভাব ধ্বংস করিয়াছিলেন; গুপ্তবংশের কন্যা বিবাহ করিয়া জয়বর্দ্ধন ধন্য হইয়াছিলেন; রাজ্যবর্দ্ধনের প্রতাপে পর্ব্বতরাজের হিমানীমণ্ডিত শিখরে বসিয়া কাম্বোজরাজ ভয়ে কম্পিত হইতেন; পুরুষপুর হইতে কামরূপনগর পর্য্যন্ত, হিমবানের পাদমূল হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; পর্ব্বতরক্ষিত আটবিক প্রদেশ তখনও উত্তরাপথ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নাই। কান্যকুব্জ হইতে সম্রাট দূত প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য দক্ষিণকোশলে তীর্থযাত্রায় নির্গত হইবেন। সম্রাটের দূত ভগ্নগৃহে দর্ভশয্যায় আসনগ্রহণ করিয়া আটবিক প্রদেশের মুকুটবিহীন সম্রাটের সম্মুখীন হইয়াছেন। সুবর্ণগৌরকান্তি শুভ্রজটামণ্ডিতশীর্ষ ছিন্ন গৈরিকপরিহিত মঠাধ্যক্ষ কুশাসনে বসিয়া রাজদূতের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। মঠবাসিগণকে দেখিয়া রাষ্ট্রনীতিকূটকুশল রাজকর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়াছেন, তাঁহার মনে সন্দেহের পরিবর্ত্তে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। প্রভাতে আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমার শীর্ষে হস্তস্থাপন করিয়া স্থবির মঠাধ্যক্ষ বলিতেছেন, "মহাত্মন্, আমাদিগের সহিত ছলনার আবশ্যকতা নাই, আর্য্যাবর্ত্ত-রাজের বিজিগীষা পরিতৃপ্ত হয় নাই, বিস্তৃত উত্তরাপথ তাঁহার রাজ্যলাভেচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর সহিত ছলনার প্রয়োজন নাই। আটবিক প্রদেশ ও দক্ষিণাপথের প্রতি হর্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। দেবাদিদেবের পরিচর্য্যায় গুরুপরম্পরায় শতাধিক বর্ষ এই বনমধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, মহেশ্বরের অনুকম্পায় বর্ব্বরগণ শান্ত ও শিক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন কোশল রাজ্যের উর্ব্বর ভূমি বহুরত্নপ্রসবিনী, উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ রাজগণের লোলুপ দৃষ্টি বহুকাল হইতে ইহার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাহা অনুভব

করিয়া শঙ্কিতচিত্তে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমরা বর্ব্বর শাসন করিয়াছি বটে, কিন্তু দেশ রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। ত্রিশূল লইয়া চালুক্য ও বর্দ্ধন রাজগণের বিজয়বাহিনীর সম্মুখীন হইতে যাইব না, ইহা নিশ্চয়। আপনি কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, দেবাদিদেবের শিরস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, নীরবে, নিঃশব্দে, বিনা রক্তপাতে বিশাল কোশলরাজ্য আর্য্যাবর্ত্তরাজের পদানত হইবে, একজন মঠবাসীও বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে না। গ্রামে গ্রামে মাণ্ডলিকগণ স্বাধীনতা হারাইয়া উত্তেজিত হইবে বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের অবাধ্য হইবে না, আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কেহই হস্তোত্তোলন করিবে না। হর্ষবর্দ্ধন নির্ব্বিঘ্নে আটবিক প্রদেশ অধিকার করিবেন; কিন্তু দক্ষিণাপথে চালুক্য তাহা সহিবে না। কোশল হইতে বাতাপিপুর বহু যোজন পথ। হর্ষবর্দ্ধন কোশলে পদার্পণ করিলে সত্যাশ্রয় পুলকেশীর সিংহাসন কম্পিত হইবে। দূতরাজ! পূর্ব্বকালে বহু আর্য্যাবর্ত্তরাজগণ দক্ষিণাপথ জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পথ এখন আর তত সুগম নাই। দক্ষিণাপথে নূতন বল সঞ্চারিত হইয়াছে, মঙ্গলেশের বংশধরগণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না। মহাত্মন্, কান্যকুব্জরাজপদে নিবেদন করিও, বিপদ আটবিক কোশলে নাই। বাতাপিপুরে ও নর্ম্মদা তীরে তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিও। দেবাদিদেবের আদেশে আমরা নতশিরে হর্ষবর্দ্ধনের আদেশ পালন করিব; কিন্তু জানিয়া রাখিও, আর্য্যাবর্ত্তে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়গাথার সমতুল কাহিনী আর কখনও শ্রুত হইবে না।”

নতমস্তকে স্থান্বীশ্বররাজের দূত মঠসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল। বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, মঠবাসিগণ প্রথমেই আমার দেহমার্জ্জনা করিয়া আমাকে শিবলিঙ্গের আকার প্রদান করিয়াছিল এবং প্রতিদিন

মহাসমারোহে আমার অর্চ্চনা করিত। কিন্তু যিনি মানবজাতির হিতসুখার্থ রাজ্যসম্পদ ও সংসারসুখ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাপথবাসিগণের দ্বারে দ্বারে নগ্নপদে সুসংবাদ বিতরণ করিয়াছিলেন তাঁহার দেহাবশেষ অদূরে শিলাস্তূপের মধ্যে সমাহিত ছিল; তাহার প্রতি কেহ ফিরিয়াও চাহিত না। ইহাই মানব প্রকৃতি।

উত্তরাপথের লক্ষ লক্ষ সেনা আটবিক কোশলে প্রবেশ করিল। চির-স্বাধীন বর্ব্বরগণ বুঝিয়াছিল যে, ইহা দেবযাত্রা বা তীর্থযাত্রা নহে, হর্ষবর্দ্ধনের দক্ষিণাপথবিজয়যাত্রা। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নগ্নপদে বিচরণ করিয়া সন্ন্যাসিগণ উদ্ধতস্বভাব বর্ব্বর মাণ্ডলিকগণকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষের কথা সত্য হইল, এক বিন্দু রক্ত ব্যয় না করিয়াও বিশাল সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ হর্ষবদ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সম্রাট যাঁহাকে দূত স্বরূপ কোশলে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি রাজসকাশে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোশল বিজিত হইল; দক্ষিণাপথের দ্বার অধিকৃত হইল। সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে কোশল হইতে বিদিশা, বিদিশা হইতে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান হইতে বাতাপিনগরে উপস্থিত হইল। চালুক্য-রাজ বিপদ বুঝিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। নর্ম্মদাতীরে বৃহৎ সেনানিবাস স্থাপিত হইল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা আটবিক কোশলের নানাস্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিতেছিল। সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বর্ব্বর গ্রামবাসী ও মাণ্ডলিকগণ সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় কোন স্থানেই বিবাদবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে নাই। ধীরে ধীরে নর্ম্মদাতীরে নানাস্থানে সৈন্য সমাবিষ্ট হইল, তখন সম্রাট স্বয়ং কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া কোশলে প্রবেশ করিলেন। দুর্গপ্রাকারস্বরূপ

ধবলশিলামণ্ডিত নর্ম্মদার উচ্চ তীরের পার্শ্বে থাকিয়া বাতাপিনগরের সেনা ঘট্ট রক্ষা করিতেছিল। সামান্য সেনা লইয়া চালুক্য সেনাপতি সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বর্ষাজলপ্লাবিত নর্ম্মদা শিলাসঙ্কুল উপকূলের জন্য উত্তরাপথের সেনাধ্যক্ষগণের নিকট দুস্তর হইয়া উঠিয়াছিল।

তীর্থযাত্রার ছলে প্রচ্ছন্নভাবে দক্ষিণাপথবিজয়যাত্রায় নির্গত হইয়া হর্ষবর্দ্ধন তীর্থের কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। আটবিক কোশলে আসিয়া সম্রাট মঠ ও স্তূপ দর্শনের অভিপ্রায় জানাইয়া মঠস্বামীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে হর্ষবর্দ্ধন আত্মীয় স্বজন ও প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষগণ সমভিব্যাহারে মঠদর্শনে আসিলেন। মঠস্বামী সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিলেন। সম্রাট কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তূপের ধ্বংসাবশেষমধ্যে আসিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ও একবার মহাদেব আকারধারী আমার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। সম্রাট সত্বর তীর্থযাত্রা সমাপন করিয়া নর্ম্মদাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তিনি ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া স্তূপে আইসেন নাই।

বর্ষা অতীত হইলে হর্ষবর্দ্ধনের সেনা নানাস্থানে নর্ম্মদা পার হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সর্ব্বত্র পাষাণের অন্তরালে থাকিয়া চালুক্য সেনা তাহাদিগের গতিরোধ করিল। নৌকা বা নৌসেতু কোনও উপায়ে যখন নর্ম্মদার দক্ষিণ কূল অধিকৃত হইল না, তখন হর্ষবর্দ্ধন নানাস্থান হইতে সৈন্য একত্র করিয়া স্বয়ং সৈন্যচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফল তোমাদিগের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। যে চরণযুগল আর্য্যাবর্ত্তের অশেষ রাজমণ্ডলীর মুকুটমণির প্রভায় আলোকিত হইয়াছিল, তাহা কখনও নর্ম্মদার দক্ষিণতীর স্পর্শ করে নাই। বার বার পরাজিত হইয়া হর্ষবর্দ্ধন

অবশেষে নর্ম্মদাতীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষকাল চালুক্যরাজ আত্মরক্ষার্থ নর্ম্মদাতটরক্ষা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নদীর উভয় কূলে বৃহৎ সেনা-নিবাস স্থাপিত ছিল। হর্ষের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আশা উন্মূলিত হইল, পুলকেশী দক্ষিণাপথের শত শত স্থানে স্বীয় বিজয়কাহিনী ও উত্তরাপথ সম্রাটের পরাজয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফলে আটবিক কোশলে ঘোরতর অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছিল। হর্ষ বর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র উৎপীড়িত বর্ব্বরজাতি এক মাসের মধ্যে উত্তরাপথের সেনা ভাগীরথীর পরপারে রাখিয়া আসিয়াছিল।

---

[১৪]

নিদাঘের উত্তপ্ত প্রবল বায়ুর সম্মুখে বালুকাস্তূপের ন্যায় হর্ষের সাম্রাজ্য কোথায় উড়িয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। আর্য্যাবর্ত্ত পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। ক্রমে সমৃদ্ধিশালী জনপদ সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র আটবিকরাজ্য মহাকোশল আখ্যা লাভ করিল। হর্ষের সময়ে যে রাজকর্ম্মচারী কোশল শাসন করিতেন তিনি যথাসময়ে রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া কোশলের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ধনভূতির নগরের বহির্দ্দেশে স্তূপের সন্নিধানে নূতন রাজবংশের নূতন রাজধানী স্থাপিত হইল। আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে এই নূতন রাজবংশের নাম এখনও অজ্ঞাত। নূতন রাজার বংশধরগণ বর্ব্বর কন্যা বিবাহ করিয়া যে মিশ্রজাতি উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহারা উত্তরকালে, ইতিহাসে, চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্ল নামে পরিচিত হইয়াছিল। আটবিক প্রদেশের উন্নতির সহিত মঠেরও উন্নতি হইতেছিল। মঠবাসিগণ রাজ্য পরিচালনা পরিত্যাগ করিলেও প্রভূত শক্তিশালী ছিলেন। রাজগণ ও বর্ব্বর দলপতিগণ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও ভূমিদানে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতেন; ক্রমে ধনশালী, শক্তিশালী শৈব মঠবাসিগণ কোশল রাজ্যের রাজশক্তির সমান বলশালী হইয়াছিলেন। মঠের উন্নতির সহিত মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারও উন্নতি হইয়াছিল। আমার মস্তকের উপরে বহুদূর দেশ হইতে আনীত নানা বর্ণের পাষাণখণ্ডসমূহ যোজনা করিয়া মঠবাসিগণ এক অত্যদ্ভুত বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার গগনস্পর্শী চূড়ায় শুভ্র রজতনির্ম্মিত ত্রিশূল ভগবান দেবাদিদেবের মহিমা ঘোষণা

করিত। প্রতিদিন শত শত নরনারী আমাকে দর্শন করিতে আসিত। পুষ্পচন্দন ও বিল্বপত্রে আমাকে আচ্ছাদিত করিত, দধিদুগ্ধঘৃতমধু ও জলধারায় আমার দেহ পিচ্ছিল করিয়া রাখিত, সুবর্ণ ও রজত খণ্ড বর্ষণে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া মঠের কোষ পরিপূর্ণ করিত। বন্ধ্যা আমার নিকট পুত্র কামনা করিত, কুমারী ভর্ত্তা কামনা করিত, নির্ধন ধনকামনা করিত, যোদ্ধা জয়কামনা করিত। কাহারও কামনা যদি অকস্মাৎ দৈববলে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে আমার শক্তির উপরে মহাকোশলবাসিগণের বিশ্বাস শতগুণ বর্দ্ধিত হইত, আমি তাহাদিগকে বলিতাম যে আমি চলচ্ছক্তিহীন পাষাণ খণ্ড, আমাতে দেবত্বের কোন চিহ্ন নাই। বাসনাপূর্ণ করিবার ক্ষমতা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে আমি বৌদ্ধস্তূপের বেষ্টনীর স্তম্ভ হইতে দেবাদি-দেব মহাদেবে পরিণত হইতাম না, তাহা হইলে মহাস্থবিরের সযত্ন নির্ম্মিত স্তূপে ধ্বংসাবশেষের উপরে ব্রাহ্মণের দেবতার মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারিত না, ধনভূতির নগরশীর্ষে আভীর রমণী মেষচারণ করিতে পারিত না। কিন্তু আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিত না, আমার ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাহাদিগের ছিল না। শত শত বৃহৎ ঘণ্টার ঘোর রোলে শত শত নরনারীর মুখনিঃসৃত "শিব শিব শম্ভো" "হর হর মহাদেব" শব্দে বৃহৎ মন্দিরের ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হইত, নিশ্চল পাষাণের অস্ফুট ভাষা জনসঙ্ঘের শ্রুতিগোচর হইত না। ক্রমে অবিশ্রান্ত জল বর্ষণে আমার তৈলাক্তদেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। এক দিন রাত্রিকালে মঠবাসিগণ গোপনে দুইজন তরুণ শিল্পির সাহায্যে অমার জীর্ণদেহ তাম্রমিশ্রিত রজতখণ্ডের দ্বারা যোজনা করিল, ও রজনী শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে নিহত করিয়া, মন্দির তলে

আচ্ছাদনের পাষাণনিম্নে তাহাদিগের শবদেহ সমাহিত করিল। এই রূপে কত দিন অতিবাহিত হইল তাহা বলিতে পারি না। শুনিয়াছিলাম হর্ষের মাতুলপুত্র ভণ্ডির বংশ কাণ্যকুব্জে সিংহাসনারোহণ করিয়া সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়াছিল। তাহার পর কি হইল তাহা শুনিতে পাই নাই। শুনিয়াছিলাম মগধে প্রভাকরবর্দ্ধনের মাতুলপুত্র সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া কিছুদিন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সম্রাট দেখিতে পাওয়া যাইত। আর্য্যাবর্ত্তে যত নগর ছিল তাহা অপেক্ষা সাম্রাজ্যের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল, দেশের লোকে সম্রাট বলিলে সামান্য ভূস্বামী বুঝিত।

ক্রমে মন্দির জীর্ণ হইল, মঠবাসিগণ অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া বিলাসিতার স্রোতে নিমগ্ন হইলেন। যে ক্ষমতার বলে তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বর্ব্বর জাতির মনোহরণ করিয়াছিলেন সে ক্ষমতা অন্তর্হিত হইল। অন্যান্য ভূসম্পত্তির ন্যায় দেবাদিদেব মহাদেব আমিও অর্থাগমের উপায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণদিগের ভাষানুসারে আমি জগতের ঈশ্বর হইয়াও ইদানীং কারারুদ্ধ হইয়াছিলাম, অর্থলোলুপ মঠবাসিগণ আমার দেহ কাঞ্চন নির্ম্মিত আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত, আমার দরিদ্র ভক্তগণ আবরণের উপরে পুষ্প বিল্বপত্র ও বারিবর্ষণ করিত। কেবল যাহারা সুবর্ণ বর্ষণে আমার গৌরীপট্ট মগ্ন করিতে পারিত তাহারাই আমার পাষাণ স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইত। এইরূপে ক্ষুদ্র আটবিক রাজ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেল।

বহুদিন পরে শ্রুত হইল যে আর্য্যাবর্ত্তে পুনরায় যবন প্রবেশ করিয়াছে, পুনরায় গান্ধারে ও পঞ্চনদে যবনের অধিকার দৃষ্ট হইয়াছে। নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া যবন জাতি প্রাচীন পারসিক রাজ্য ধ্বংস

করিয়াছে, তাহাদিগের সম্মুখে প্রাচীন রাজ্য সমূহ ধূলিসাৎ হইতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে যবনেরা যখন আর একবার পঞ্চনদ অধিকার করিয়াছিল তখন তাহাদিগের যেরূপ আচার ব্যবহার ছিল এখন আর সেরূপ নাই। কেহ কেহ বলিত যে ইহারা যে যবন জাতি নহে, ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদিগের নাম শুনিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম যে যাহাদিগের শিল্পকুশলতার ফলে জীবনের প্রারম্ভে আমাদিগের আকারের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল ইহারা তাহাদিগেরই বংশধর। আমার কৌতূহল অতি শীঘ্রই নিবৃত্ত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে যবনসেনা আর্য্যাবর্ত্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল। ত্রস্ত হইয়া আটবিক নগরবাসিগণ শুনিল যে যবনেরা নগর লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। সেদিন আর আমার মন্দিরে জনতা দেখা যায় নাই, আমার উপাসকগণ বিরসবদনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া উপবেশন করিয়াছিল। দূরে যখন যবনসেনার অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল তখন যে যেদিকে পথ পাইল দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে শত শত যবন অশ্বারোহী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল, উল্কার আলোকে অন্ধকার গর্ভগৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। যবনগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, ক্ষণেকের মধ্যে গর্ভগৃহ ত্যাগ করিয়া তাহারা বিশাল মন্দির প্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। শত শত বর্ষের যত্ন-সঞ্চিত ধনরাশি বিনা বাধায় তাহাদিগের হস্তগত হইল। গর্ভগৃহের মধ্য দেশে একজন যবন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ছিল, তাহার সম্মুখে উল্কাহস্তে অপর দুইজন যবন দণ্ডায়মান ছিল; যবনসেনা লুণ্ঠনে প্রাপ্ত ধনরত্নরাজি আনয়ন করিয়া অশ্বারোহীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে মনি মুক্তা ও সুবর্ণের স্তূপ নির্ম্মিত হইল। ক্রমে ক্রমে একে একে যবনগণ গর্ভগৃহে আসিয়া সম্মিলিত হইল, তাহাদিগের আকার

ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার কোন বিষয়েই প্রাচীন যবনদিগের সহিত সাদৃশ্য ছিল না। আকারে তাহারা শক এবং হূণদিগের অনুরূপ, পরিচ্ছদে বনবাসী বর্ব্বরগণের এবং আচার ব্যবহারে চণ্ডালসদৃশ। যখন লুণ্ঠন করিবার কিছু আর অবশিষ্ট রহিল না, তখন দলপতির আদেশে যবনসেনা আমার আবরণ মোচন করিল। আবরণের অভ্যন্তরে নীরস পাষাণ ব্যতীত আর কিছুই নাই দেখিয়া যবনগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে গদা ও পরশুর আঘাতে আমার উর্দ্ধদেশ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, বর্ত্তমান সময়ে বিংশতি শতাব্দীর চিত্রশালায় আমার যে আকার দেখিতেছ, এ আকার যবনগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। হতাশ্বাস হইয়া যবনসেনা আমাকে পরিত্যাগ করিল। দলপতির আদেশে লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্যসম্ভার ক্রমে ক্রমে মন্দিরের বহির্দ্দেশে প্রেরিত হইল। তাহার পর যবনগণ শুষ্ক কাষ্ঠে গর্ভগৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল, দেখিতে দেখিতে ইন্ধনের চূড়া মন্দিরাভ্যন্তরের শিখর-দেশ স্পর্শ করিল; তখন কাষ্ঠরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া যবনগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মন্দির প্রাঙ্গণের শত শত স্থান হইতে লেলিহান অগ্নিশিখা মন্দিরের পাষাণখণ্ড সমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। গর্ভ-গৃহে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, অন্তরে ও বাহিরে উভয় দিক হইতে প্রবল অগ্ন্যুত্তাপ আসিয়া এক এক খানি করিয়া পাষাণ স্থানচ্যুত করিতে লাগিল। গর্ভগৃহের মধ্যে উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন মন্দির প্রাঙ্গণে অগ্নিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে ভিত্তির বন্ধন শিথিল হইয়া আসিলে মহাশব্দের সহিত বৃহৎ মন্দির-শিখর ভূপতিত হইল, গুরুভার পাষাণখণ্ড সমূহ গর্ভগৃহের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল বটে, কিন্তু গর্ভগৃহের আর কোন চিহ্নই রহিল না। পাষাণরাশির নিম্নে পড়িয়া আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসৃত

হইলাম। তাহার পর বহুকাল যাবৎ আলোক, জগত বা মানব দেখি নাই।

সময় অতিবাহিত হইতেছিল, কত? তাহা কে নিরূপণ করিবে? এই সুদীর্ঘকালমধ্যে কখনও আলোক দেখিতে পাই নাই, কখনও মানবের মুখ দর্শন করি নাই। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ যে পাষাণ স্তূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহার উপরিভাগের পাষাণখণ্ডগুলি আমাদিগকে বলিয়া দিত যে যবনগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বর্ব্বরজাতি সমতলভূমি পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তবিক কোশলের সমগ্র সমতলভূমি পুনরায় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, পর্ব্বতবাসী বর্ব্বর-জাতি ধীরে ধীরে সভ্যতার সংস্পর্শের অভাবে অসভ্য হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাব তখনও তাহাদিগের মন হইতে দূরীভূত হয় নাই বলিয়া তখনও তাহারা সময়ে সময়ে সপুত্রকলত্র নিবিড় বন ভেদ করিয়া মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অর্চ্চনা করিতে আসিত। কাহার মন্দির, কে উপাস্য দেবতা? তাহা তাহারা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। এই মাত্র তাহাদিগের স্মরণ ছিল যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভগ্ন পাষাণের স্তূপ তাহা-দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের উপাসনার স্থান, সেই জন্যই তাহারা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের অশেষ বিপদজনক পথ অতিক্রম করিয়া জনশূন্য, দেবশূন্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ উপাসনা করিতে আসিত। সময়ে সময়ে তাহাদিগের গ্রামবৃদ্ধগণ সন্ধ্যায় গৃহদ্বারে বসিয়া বালক ও যুবকগণকে মন্দিরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও তাহাদিগের অতীত গৌরবের কথা উপাখ্যানের ন্যায় বিবৃত করিতেন; মঠবাসী সন্ন্যাসিগণের আশ্চর্য্য বিদ্যাবত্তা, অপরিসীম করুণা ও অত্যাশ্চর্য্য রাজনীতি-কুশলতার কথা বলিয়া গ্রাম্য যুবকদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিতেন। আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া তাহারা যখন

মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিতে আসিত, তখন বিশাল পাষাণ স্তূপের বিশালতা দেখিয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া আত্মহারা হইয়া কত কথাই বলিত। এইরূপে যুগের পর যুগ কাটিয়া গেল।

ক্রমে শুনিলাম অরণ্যান্তর হইতে নূতন বর্ব্বরজাতি আমাদিগের চতুষ্পার্শস্থিত অরণ্যে আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয় না যে তাহারা কখনও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে। শুনিতাম তাহারা আসিবার পরে পর্ব্বতবাসিগণ আর সদা সর্ব্বদা অরণ্যপথ অতি-বাহন করিয়া মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অর্চ্চনা করিতে বসিতে সাহসী হইত না। কিন্তু সময়ে সময়ে তাহারা আসিত। তাহাদিগের গ্রামবৃদ্ধগণের মনে তখনও বদ্ধমূল সংস্কার ছিল যে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে পাষাণ স্তূপের অর্চ্চনা করা অত্যন্ত আবশ্যক, পূর্ব্বপুরুষগণের আখ্যায়িকা শ্রবণে তাহারা জানিয়া রাখিয়াছিল যে, এই সকল তিথিতে মঠবাসিগণ সমারোহে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চ্চনা করিতেন। এই সকল তিথিতে পর্ব্বতবাসী প্রাচীন বর্ব্বরজাতি সশস্ত্র হইয়া মন্দিরের ভগ্ন স্তূপ অর্চ্চনা করিতে আসিত। নূতন বর্ব্বরজাতি বনমধ্যে বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া তাহাদিগের পূজার্চ্চনার বিধি লক্ষ্য করিয়া দেখিত। কিছুকাল দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের মনেও বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া গেল যে, এই পাষাণ স্তূপে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে, ইহার কোন স্থানে কোনও নিভৃত কোণে নিশ্চয়ই শিষ্ট বা দুষ্ট দেবতা লুকায়িত আছে। এই বন নিশ্চয়ই সেই দেবতার রাজ্য, নতুবা সুদূর বনপ্রান্তে অবস্থিত পর্ব্বতমালার অধিবাসিগণ কি কারণে এই বিপদসঙ্কুল অরণ্যপথ অতিবাহিত করিয়া এই ভগ্ন পাষাণখণ্ডসমূহের অর্চ্চনা করিতে আসিয়া থাকে ?

শিশু যেমন অন্ধকার দেখিয়া ভীত হয়, বিজনে অজ্ঞাতপথ অবলম্বন করিতে মানব হৃদয় যেমন কম্পিত হয়, শিশুবৎ আটবিক জাতিও সেইরূপ ভয়ে অভিভূত হইল। তাহাদিগের গ্রামবৃদ্ধগণ এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব বন-দেবতার সন্তোষ সাধনে সচেষ্ট হইল। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতাম সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন মানবজাতি উপাসনার জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল, অমূলক ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যুগের পর যুগ মানবজাতি শ্রদ্ধায় বা ভয়ে সেই স্থানে নতশির হইতেছে। ধীরে ধীরে ভগ্ন পাষাণের স্তূপ নবাগত জাতির উপাসনার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। মন্দিরের ভগ্নাব-শেষের এক পার্শ্বে পর্ব্বতবাসিগণ চন্দন লেপন করিয়া আমার উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল নিবেদন করিত, তাহার অপর পার্শ্বে নূতন আটবিক জাতি তাহাদিগের সুচিরাগত প্রথানুসারে শূকর, কুক্কুট বলি দিয়া মদ্য মাংসের উপহার সমেত আমাদিগের অর্চ্চনা করিত। এই দীর্ঘকালে মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপরে অনেকগুলি দীর্ঘাকার বৃক্ষ জন্মিয়াছিল, তাহারাও উপাসনার অংশ লাভ করিত। নবাগত বর্ব্বরজাতি ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিতেছিল। প্রথমে তাহারা বন্য পশু হনন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগের মাংসে অন্ন সংস্থান ও চর্ম্মে আচ্ছাদন হইত। ক্রমে পর্ব্বতবাসী বর্ব্বরগণের রীতি নীতি অনুসরণ করিয়া তাহারা হলকর্ষণ করিতে শিক্ষা করিল, ক্রমে বন পরিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল।

একদিন আমাদিগের উপরিস্থিত পাষাণখণ্ডগুলি কহিল যে অরণ্যবাসী বর্ব্বরগণের উপাসনা দেখিতে একজন নূতন মানব আসিয়াছে, তাহার বর্ণ শ্বেত, পরিচ্ছদ বিদেশীয় ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব। সে ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইয়া বর্ব্বরজাতির উপাসনা দেখিয়া চলিয়া গেল। আমাদিগের নিকটে আসিল না বা আমাদিগকে স্পর্শ করিল না। শ্বেতকায় মানবের কথা শুনিয়া

আমাদিগের মনে বড় কৌতুহল হইল। যে সমস্ত পাষাণখণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরিভাগে পতিত ছিল তাহারা নবীন স্তূপের পাষাণের ন্যায় প্রবীণ নহে। আমরা মানবজাতির অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে বহু শ্বেতকায় মানব দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা যখন পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে আনীত হইয়াছে, তখন শ্বেত কৃষ্ণের সংমিশ্রণে নূতন বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

একদিন দ্বিপ্রহরে আমাদিগের উপরিস্থিত পাষাণগুলি হঠাৎ বলিয়া উঠিল যে পূর্ব্ব বর্ণিত শ্বেতাঙ্গের ন্যায় আরও কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ মনুষ্য আমাদিগের দিকে আসিতেছে। তখন স্তূপ সান্নিধ্যে হেমন্তের উজ্জ্বল রবিকরস্নাতঃ মধ্যাহ্নে বর্ব্বর বালক-বালিকাগুলি মন্দিরের ভগ্নাবশেষের চারি পার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা শ্বেতাঙ্গ মনুষ্য দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শুনিলাম শ্বেতাঙ্গগণ ভগ্নাবশিষ্টের উপরে উঠিয়া সযত্নে পাষাণখণ্ডগুলি পরীক্ষা করিল। তখন ভগ্ন স্তূপের উপরে ভিন্ন ভিন্ন যুগে আনীত বিবিধ বর্ণের পাষাণ পতিত ছিল, তাহারা সযত্নে সেইগুলি পরীক্ষা করিতেছিল। তাহাদিগের করস্পর্শে বোধ হইতেছিল যে বহু প্রাচীন পাষাণ স্পর্শ করিয়া তাহাদিগের হস্তগুলির এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে তাহারা স্পর্শমাত্রে বিভিন্নতা অনুভব করিতে পারে। বহুক্ষণ ধরিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া শ্বেতাঙ্গগণ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে স্তূপ-সন্নিধি পরিত্যাগ করিল।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে খনিত্র ও রজ্জু হস্তে দলে দলে বর্ব্বর নর-নারী আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যে একজন তাহাদিগের সহিত আসিয়াছিল; সে ব্যক্তি বৃদ্ধ, বিরলকেশ কিন্তু তাহার শ্মশ্রু ছিল। বর্ব্বরগণ শ্বেতাঙ্গের নির্দ্দেশ অনুসারে খনন করিতে আরম্ভ করিল, যে প্রস্তরে সিন্দুর লেপন করিয়া তাহারা

দেবত্ব আরোপণ করিয়াছিল তাহা ব্যতীত অপর প্রস্তরগুলি রজ্জু ও লৌহদণ্ডের সাহায্যে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এই কার্য্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে যে সমস্ত পাষাণখণ্ড যোজনা করিয়া শৈব সন্ন্যাসীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থানান্তরিত হইল। একদিন মধ্যাহ্নে শত শত বৎসর পরে তীব্র সূর্য্যালোক আসিয়া আমাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল, আমি পুনরায় প্রকাশিত হইলাম। যতদিন দেবাদিদেব মহাদেবরূপে সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতাম ততদিন দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও উদকে স্নান করিয়া আমার অঙ্গ মসৃণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মন্দিরের পতনকালে অগ্নির উত্তাপে এবং পতনশীল পাষাণখণ্ডসমূহের আঘাতে আমার অঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। যখন জগতে পুনঃ প্রকাশিত হইলাম, তখন আর দেবাদিদেব বলিয়া কেহ আমাকে সম্বোধন করিল না, কিন্তু যে বিরলকেশ শ্বেতাঙ্গ বর্ব্বরগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সে ব্যক্তি দর্শন ও স্পর্শমাত্রে আমার প্রাচীনতা অনুভব করিতে পারিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে হর্ষব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইয়াছিল। মাতা যেমন অতি সাবধানে শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া থাকে, শ্বেতাঙ্গের তত্ত্বাবধানে তেমনই সাবধানে বর্ব্বরগণ আমার সহস্র সহস্র বর্ষের বাসস্থান হইতে আমাকে উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। বিরলকেশ শ্বেতাঙ্গ বহুক্ষণ ধরিয়া আমাকে পরীক্ষা করিল, আমাকে দর্শন করিয়া হর্ষে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তখন খনিত্র হস্তে বর্ব্বরগণ খনন করিতে আরম্ভ করিল; ধীরে ধীরে সযত্নে ভূগর্ভে সজ্জিত প্রস্তরগুলি দিবালোকে প্রকাশ করিতে লাগিল,

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বিরলকেশ শ্বেতাঙ্গ তাহাদিগের কার্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহার জীবনে এমন সৌভাগ্য বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। ধীরে ধীরে পরিক্রমণের পথ, বেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষ, যশোধর্ম্মের যুগ, কনিষ্কের যুগ, ধনভূতির যুগ ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় সূর্য্যালোক দর্শন করিল। শ্বেতাঙ্গের নির্দ্দেশানুসারে বর্ব্বরগণ প্রাচীন পাষাণখণ্ডগুলি উত্তোলন করিয়া আমার পার্শ্বে আনয়ন করিল। তাহার পরে আমাদিগের অঙ্গে সযত্নে কার্পাস ও বস্ত্রের আচ্ছাদন দিয়া আমাদিগকে কাষ্ঠাধারে আবদ্ধ করিল।

মনে হইল যেন কোথায় চলিতেছি, তাহারা আমাদিগকে গোযানের সাহায্যে কোথায় লইয়া যাইতেছিল। একস্থানে আমাদিগকে গোযান হইতে উত্তোলন করিয়া যানান্তরে স্থাপন করিল। দ্বিতীয় যান অত্যন্ত দ্রুতগামী, সেরূপ দ্রুতগামী বাহন আমি কখনও দেখি নাই, বায়ুর বেগ অনুভব করিয়া বুঝিতেছিলাম যে অত্যন্ত দ্রুতবেগে পথ অতিবাহিত হইতেছে। কয়েক দিবস পরে যাহারা আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিল, তাহারা পুনরায় আমাদিগকে যানান্তরে স্থাপন করিল, অনুভবে বুঝিলাম পুনরায় গোযানে আরোহণ করিয়াছি। সেই দিনই পুনরায় দিবালোক দর্শন করিলাম, শত শত লোক আমাদিগকে দর্শন করিতে আসিল, তদবধি এই স্থানেই অবস্থান করিতেছি।

পরিশিষ্ট।

অ

অধিষ্ঠানাধিকরণ—নগরের প্রধান বিচারপতি।

অনুগাঙ্গ—গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ।

অন্তর্ব্বেদী—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত ভূভাগের অপর নাম।

অভিধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা } বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থদ্বয়ের নাম।
অভিধর্ম্মবিভাষা শাস্ত্র }

অলসন্দ—Alexandria, যবনরাজ আলেক্জান্দার ভারতের উত্তর-
পশ্চিম সীমান্তে স্বনামে অনেকগুলি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

অহিচ্ছত্র—পঞ্চাল রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী, ইহা আধুনিক বেরিলী
জেলায় অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম রামনগর।

অর্হৎ—সিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যগণের নাম।

আ

আর্ত্তিমিদর—গ্রীক্ নাম (Artemidoros)

আনর্ত্ত—সুরাট্ ও গুজ্‌রাটের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের প্রাচীন নাম।

আন্তিয়োক—আলেক্জান্দারের সেনাপতি সিলিউকস্ নিকেটরের
বংশজাত সিরিয়ারাজ ৩য় আন্তিয়োক (Antiochos III)

আলম্বন—রেলিংএর ঊর্দ্ধভাগ (Architrave)

উ

উদ্যান—প্রাচীন গান্ধারের নিকটবর্ত্তী দেশ বিশেষ। ইহার বর্ত্তমান
নাম 'হাজারা'

উপাসক—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ।

উপাসিকা—ঐ স্ত্রী।

উরস—ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত প্রদেশ।

ঐ

ঐরাণ—পারস্যের প্রাচীন নাম। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুদ্রায় ঐরাণ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে (Catalogue of the coins, Indian museum vol. I, P. 234, note 1.)

ক

কনকমুনি }
ক্রকুচ্ছন্দ } গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের নাম। বৌদ্ধ মতানুসারে গৌতমের পূর্ব্বে আর পাঁচজন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কপিশা—প্রাচীন কপিশার অবস্থান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে কপিশা কাবুলের প্রাচীন নাম। কেহ বলেন ইহা জেলালাবাদের চারিপার্শ্বস্থিত প্রদেশের প্রাচীন নাম।

করুষ—আরা জিলার প্রাচীন নাম।

কিন্নরধ্বজ—অগ্রভাগে কিন্নরমূর্ত্তিযুক্ত ধ্বজ।

কীকট—মগধ বা বিহারের প্রাচীন নাম।

কীর—ত্রিগর্ত্তের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের নাম।

কুক্কুটপাদবিহার—ইহার অপর নাম কুক্কুটারাম। ইহা প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের একটী সঙ্ঘারাম।

কুরুবর্ষ—মধ্য এসিয়ার প্রাচীন নাম।

কুশীনগরী বা কুশীনার—মল্লরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী, বর্ত্তমান অবস্থান অজ্ঞাত। এই স্থানে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হইয়াছিল।

কোশাম্বী—উদয়নের রাজধানী, বর্ত্তমান নাম কোশাম, এলাহাবাদ হইতে পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গ

গণ—খর্ব্বাকৃতি লম্বোদর মনুষ্য।

গর্ভগৃহ—মন্দিরের বা স্তূপের অভ্যন্তরস্থিত প্রকোষ্ঠ।

গর্ভচৈত্য—যে সকল চৈত্য বা স্তূপের একটী কক্ষ থাকিত তাহার নাম গর্ভচৈত্য। এই সকল কক্ষে বুদ্ধের বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধানগণের অস্থি বা ভস্ম রক্ষিত হইত।

গান্ধার—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দেশ-বিশেষ। প্রাচীন গান্ধার দেশ বর্ত্তমান কালের পেশোয়ার ও বন্নু জিলায় অবস্থিত ছিল। প্রাচীন গান্ধারবাসিগণ খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন গান্ধার পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে যে নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই বর্ত্তমান নাম কন্দাহার (Cunningham—Archaeological Survey Reports vol. XVI. P.)

ঘ

ঘট্ট—ঘাট।

চ

চম্পা—বর্ত্তমান ভাগলপুর নগরের অনতিদূরে অবস্থিত।

চোলমণ্ডল—ভারতের দক্ষিণপূর্ব্ব সমুদ্রোপকূল।

জ

জাউল—জউল বা জউব্ল, শক ও হূণজাতির অংশ বিশেষের নাম।

জাতক—বুদ্ধগণের পূর্ব্বজন্মের কাহিনী।

জালন্ধর—বর্ত্তমান নাম জলন্দর।

ট

টক্ক—পঞ্চনদ বা পাঞ্জাবের প্রাচীন নাম।

ত

তক্ষশিলা—ইহার ধ্বংশাবশেষ রাওলপিণ্ডি জিলার সরাইকালার নামক স্থানে অবস্থিত। ইহাই গ্রীক্‌দিগের ট্যাক্‌সিলা (Taxila)।

তীরভুক্তি—বর্ত্তমান নাম ত্রিহুৎ বা তির্‌হুৎ।

তুষিতস্বর্গ—বৌদ্ধ মতানুসারে একটী স্বর্গের নাম।

ত্রিগর্ত্ত—বর্ত্তমান নাম কাঙ্গড়া।

ত্রিরত্ন—বৌদ্ধ Trinity, রত্নত্রয়ের নাম ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ।

থ

থৈদোর—গ্রীক্ নাম (Theodoros)।

দ

দশপুর—বর্ত্তমান নাম মন্দশোর, ইহা মালবের একটী প্রাচীন নগর।

দশশীল—বৌদ্ধধর্ম্মের দশটী নিয়ম।

দণ্ডপাশিক—ফৌজদারী বিভাগের কারাধ্যক্ষ।

দেবপুত্র—কুষণবংশের সম্রাটগণের উপাধি। প্রাচীনকালে চীনের সম্রাট, পারদ-সম্রাট ও কুষণ-সম্রাট এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধ

ধর্ম্মচক্র—বুদ্ধদেব বারাণসীতে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তাঁহার নাম ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনা। প্রস্তরশিল্পে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনা দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইত :—

(১) চক্র—ইহার অর্থ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রথম ধর্ম্মপ্রচার, (২) চক্রের নিম্নে দুইটী মৃগ,—ইহার অর্থ এই যে বারাণসীর উপকণ্ঠে মৃগদাব নামক স্থানে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

ন

নগরহার—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটী প্রাচীন নগর।

নবপত্রিকা—প্রস্তরশিল্পের পারিভাষিক শব্দ।

নিগম—শ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ বা কুলিকগণের সাম্প্রদায়িক সভা (Guild)

নৈম—অর্দ্ধ।

নৌবাটক—যুদ্ধের নৌকাশ্রেণী।

প

পারদ—পার্থিয়ান (Parthian) মনুসংহিতায় পারদ জাতির উল্লেখ আছে।

পু-আহিত—মিশরদেশীয় খোদিতলিপিসমূহে উল্লিখিত দেশের নাম।

পুরু = পুর = পরষাবর = পেষাবর = বর্ত্তমান পেশোয়ার।

পুলিন্দ—ইহার বর্ত্তমান অবস্থান অজ্ঞাত। অশোকের খোদিত-লিপিতে অন্ধ্রজাতির সহিত পুলিন্দজাতির নামযুক্ত থাকায় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে পুলিন্দজাতি দক্ষিণাপথবাসী ছিল।

ভ

ভাণ্ডাগারিক—ভাণ্ডারী

ভিক্ষু—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

ভিক্ষুণী—বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী

ভুক্তি—প্রদেশের অংশবিশেষ, সরকার (Division)

ভৃগুকচ্ছ = ভরুকচ্ছ = ভরোচ (Broach)

ম

মণ্ডল—প্রদেশের অংশ, পরগণা

মৎস্য—পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে আধুনিক জয়পুর রাজ্যই মৎস্য দেশ।

মদ্রদেশ—পঞ্চনদের প্রদেশ বিশেষের প্রাচীন নাম।

মরু—যোধপুরের প্রাচীন নাম।

মহাকোশল—আধুনিক মধ্যপ্রদেশের উত্তরভাগের প্রাচীন নাম।

মহাদণ্ডনায়ক—প্রধান বিচারপতি (ফৌজদারী বিভাগের)।

মহাপ্রতীহার—পুররক্ষিগণের অধ্যক্ষ।

মহাবলাধিকৃত—প্রধান সেনাপতি।

মহাস্থবির—বৌদ্ধসঙ্ঘের বা মঠের প্রধান ভিক্ষু।

মাখেতা—গ্রীক্‌নাম (Machet as)

মায়াপুর—হরিদ্বারের অপর নাম।

মিশর বা মিস্রাইম—আধুনিক ইজিপ্টের (Egypt) নামান্তর।

মূলস্থানপুর—বর্ত্তমান নাম মূলতান।

মেনন্দ্র—মিলিন্দ বা মেনাণ্ডার (Menandar), ইঁহার মুদ্রায় ভারতীয় অক্ষরে মেনন্দ্র নাম লিখিত থাকে।

য

যুবরাজ ভট্টারকপাদীয়—অর্থাৎ যাহার পদ যুবরাজগণের সমান।

র

রাজগৃহ—বর্ত্তমান নাম রাজগির, ইহাই মহাভারতের গিরিব্রজ। পাটলিপুত্র নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ইহা মগধের রাজধানী ছিল।

রাষ্ট্রকূট—রাজপুত জাতিবিশেষের নাম। বর্ত্তমান নাম রঠোড বা রাঠোড়।

ল

লিওনাত—গ্রীক্‌নাম (Leonotos)

ব

বলদর্শন—সৈন্য প্রদর্শন (Parade)

বাবিরুষ—বভেরু বা বাবিলনের (Babylon) অপর নাম

বাহ্লীক—বাল্‌খ বা বল্‌খের প্রাচীন নাম।

বিদিশা—বর্ত্তমান নাম ভিল্‌সা। ইহা গোয়ালিয়ার রাজ্যে অবস্থিত ও ভূপাল নগরের নিকটবর্ত্তী।

বিপশ্বী— } গোতমের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের নাম। বৌদ্ধ মতানুসারে
বিশ্বভূ— } গোতমের পূর্ব্বে আর পাঁচজন বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন।

বিষয়—প্রদেশের অংশ বিশেষ, চাক্‌লা, জিলা।

বিহার—অর্থে বৌদ্ধ মন্দির বা সঙ্ঘারাম উভয়ই বুঝায়।

বৈশালী—বর্ত্তমান নাম বসার, ইহা মোজফ্‌ফরপুর জিলায় অবস্থিত।

শ

শক—জাতি বিশেষের নাম, ইহারা প্রাচীন গ্রীক্‌গণের Sakai বা Skythoi।

ষ

ষাহি—কুষণ বংশীয় সম্রাটগণের উপাধি, এখনও বহু প্রাচীন রাজপুত বংশ এই উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স

সঙ্কাস্ত—বর্ত্তমান নাম সঙ্কিসা, ইহা ইটা জিলায় অবস্থিত। প্রবাদ আছে গোতম বুদ্ধ এই স্থানে এয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘ—বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়। সঙ্ঘ, বৌদ্ধত্রিরত্নের একটি রত্ন।

সঙ্ঘারাম—Monastery ; বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের বাসস্থান।

সদ্ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মের নাম।

সাকেত—অযোধ্যা বা কোশলের নামান্তর।

সুরসেন—মথুরার প্রাচীন নাম

সুবর্ণভূমি—ব্রহ্মদেশের প্রাচীন নাম।

সুবস্তু—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নদীর নাম। ইহার বর্ত্তমান নাম সোয়াত (Swat)

সূচি—রেলিংএর অংশ বিশেষ (Cross bar)

স্তূপ—বৌদ্ধ মন্দিরবিশেষ, ইহার আকার অর্দ্ধবর্ত্তুলের (hemispherical) ন্যায়। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্তূপ বা চৈত্যের আকার বর্ণনা করিয়াছিলেন, পালি গ্রন্থবিশেষে এই কথা লিখিত আছে।

স্তূপ-বেষ্টনী—স্তূপের বা চৈত্যের চারি পার্শ্বের প্রাচীর বা রেলিং।

স্থান্বীশ্বর—বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর।

হ

হিরণ্যবহা—শোণের অপর নাম।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত।

(স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহিত)

এই পুস্তকের সমস্ত লাভ সিষ্টার নিবেদিতা-প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রদত্ত। বিদ্যালয়ে নিবেদিতা কি ভাবে মিশিতেন ও কাজ করিতেন তাহার একটী মনোজ্ঞ ও বিশদ চিত্র এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

বসুমতী বলেন—* * * পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যতগুলি রচনা পাঠ করিয়াছি, শ্রীমতী সরলাবালার "নিবেদিতা" তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

* * * *

"নিবেদিতা"র ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। নিবেদিতার হাফটোন ছবিখানিও সুন্দর হইয়াছে।